উৎস মানুষ

৩৫ বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		২
রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের দার্শনিক ঐতিহ্য	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩
অসংগঠিত মানুষ	বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	৭
অত্যাধুনিক ৪ প্রযুক্তি	শংকর ঘটক	১১
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইউটোপিয়া	রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	১৭
সাদা দুধে কালো ছায়া	গৌতম মিস্ত্রি	২০
এল নিনো ও উষ্ণায়ন	কুমারেশ মিত্র	২৬
গড়ের খেলা ক্রিকেট মাঠে	ভূপতি চক্রবর্তী	৩১
কত অজানারে জানাইলে	পুলক লাহিড়ী	৩৫
আলোর পথযাত্রী	পূরবী ঘোষ	৩৭
চিঠিপত্র		৩৯

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়: খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০ ১৩৬

ফোন: ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/
৯৮৩১৪৬১৪৬৫

ওয়েবসাইট: www.utsamanush.com

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

মূল্যবোধের কবিতা

কাকাতুয়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

কাকাতুয়া, কাকাতুয়া আমার যাদুমণি
সোনার ঘড়ি কি বলিছে বল দেখি শুনি?
বলিছে সোনার ঘড়ি– ‘‘টিক্-টিক্-টিক,
যা কিছু করিতে আছে, করে ফেল ঠিক্।
সময় চলিয়া যায়–
নদীর স্রোতের প্রায়,
যে জন না বুঝে, তারে ধিক্, শত ধিক্।’’
বলিছে সোনার ঘড়ি– টিক্-টিক্-টিক্।

কাকাতুয়া, কাকাতুয়া, আমার যাদুধন
অন্য কোনও কথা ঘড়ি বলে কি কখন?
মাঝে মাঝে বলে ঘড়ি– ‘‘ঢঙ্-ঢঙ্-ঢঙ
মানুষ হইয়া যেন হয়ো নাকো সঙ্।
ফিটফাট বাবু হ’লে,
ভেবেছ কি লবে কোলে
পলাশে কে ভালবাসে দেখে রাঙা রঙ?’’
মাঝে মাঝে বলে ঘড়ি– ঢঙ্-ঢঙ্-ঢঙ।

আধুনিক জীবন থেকে ‘মূল্যবোধ’ শব্দটা প্রায় হারাতে বসেছে। মূল্যবোধ নিয়ে কবিতা-ছড়াগুলোও। পত্রিকার পাতায় প্রায় এক দশক আগে ‘মূল্যবোধের কবিতা’ শিরোনামে বেশ কিছু কবিতা ছাপা হয়েছিল। সেগুলো এবং আরও কিছু মিলিয়ে আমরা গত বইমেলায় প্রকাশ করেছি বই– ‘মূল্যবোধ’। সেই বই থেকেই কিছু কিছু কবিতা-ছড়া দেওয়া হচ্ছে পত্রিকার পাতায়।

সম্পাদক

আমাদের কথা

বিজ্ঞানে বেনো জল

আমাদের মুনিঋষিদের অসীম ক্ষমতার কথা সবাই জানি। তাঁরা পারতেন না, এমন কাজ নেই! শরীরের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুলে আত্ম-উত্তরণ ঘটাতে পারতেন, যোগবলে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বকে কৌপিনের ট্যাঁকে গুঁজে শূন্যে ভেসে থাকতে পারতেন, শুধু রোষ কষায়িত নয়নে তাকিয়েই ভস্ম করে ফেলতে পারতেন কাউকে! রামায়ণ, মহাভারত থেকে পুরাণ হাতড়ালে ঘটনার ঘনঘটা চোখে পড়বে।

এটা ঘোর কলি। অনেকেরই দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি টলে গিয়েছে। তাঁদের জায়গা নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কারণ মুনিঋষিরা তাঁদের চমৎকারিত্ব নিজেদের জিম্মায় রাখতেন। বিজ্ঞানীরা তা আমাদের হাতেই তুলে দেন। দাঁত মাজার ব্রাশ থেকে মাইক্রোওয়েভ আভেন, গাড়ি, মোবাইল– ঘুম থেকে উঠে ইস্তক আমরা নিজেরা সেই চমৎকারিত্বে চমৎকৃত হই। সংবাদপত্রে, টিভিতে যখন বিজ্ঞানী কিছু বলেন, বিজ্ঞানের নাম নিয়ে কিছু বলা হয়, তার ওপর স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের অচলা ভক্তি জন্মে। হাতদেখা, কোষ্ঠীগণনা, ফেংসুই, রেইকি, হোমিওপ্যাথি– সবাই বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা দাবি করে। বিজ্ঞানী হাতে রত্ন ধারণ করলে, কাছা এঁটে মন্দিরে পুজো দিতে গেলে, আমাদের ভক্তিরস ঘনতর হয়।

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস বসেছিল। সারা ভারতের তাবড় বিজ্ঞানী সেখানে একজোট হয়েছিলেন। মঙ্গলগ্রহে সফল অভিযানের দৌলতে নাসার পিঠ চাপড়ানির শব্দ এখনও ভাল করে মিলিয়ে যায়নি। ফলে ভারতীয় বিজ্ঞানের ‘অচ্ছে দিন’ এসে গিয়েছে। সেই ১০২তম বিজ্ঞান কংগ্রেসে ক্যাপ্টেন আনন্দ পোডাস এবং অমেয়া যাদব একটি পেপার জমা দিয়েছেন। ওঁদের দাবি– রাইট ভাইদের বহু যুগ আগেই আকাশে ওড়ার প্রযুক্তি আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন আমাদের ঋষিরা। মহর্ষি ভরদ্বাজ অধুনিক উড়ান-প্রযুক্তির চেয়েও উন্নততর পদ্ধতি জানতেন। যা দিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশেই নয়, ভিন গ্রহেও যাতায়াত করা যেত!

এই নিয়ে যথারীতি শোরগোল উঠেছে। নাসার দুশো বিজ্ঞানীর সই-করা অনলাইন আবেদনও জমা পড়েছে। তাতে পোডাসদের পেপারটি বাতিল করার আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছে, এইভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে পৌরাণিক গাথাকে মেশালে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হবেন। আমাদের পয়সায় গবেষণার নামে এই ধরনের অশ্বডিম্ব প্রসবে উৎসাহ দেব, না পশ্চিমী চক্রান্ত বা আমাদের ঐতিহ্যকে খাটো করে দেখার চেষ্টা বলে উপেক্ষা করব, তা ভেবে দেখা উচিত।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে সি বি আই একটি তথ্য জানিয়েছে– ভারতে প্রতি ৯৪০ জনে একজন পুলিশ রয়েছে, আর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওরফে এনজিও রয়েছে প্রতি ৫৩৫ জনে একটি। এবং সব মিলিয়ে ২২ লাখের ওপর এনজিও-র ৯০ শতাংশই তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা দেয় না। রাজ্যওয়াড়ি সবচেয়ে বেশি এনজিও আছে উত্তরপ্রদেশে, প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ। আর আমাদের রাজ্যে আড়াই লাখের কাছাকাছি। সব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা তাদের কাজকে ছোট না করলেও খবরটা পড়ে এবং আশপাশের কিছু এনজিও-র রকমসকম দেখে শিবরাম চক্রবর্তীর ‘উপকার করার ব্যবসা’-র কথা কারও মনে পড়ে যেতে পারে।

ব্যঙ্গচিত্র আঁকার শাস্তি হিসাবে ফ্রান্সে বেঘোরে প্রাণ গেল অনেকের। সারা পৃথিবী নিন্দায় মুখর। বিপ্লবী বাংলা হোক কলরব না করে মিইয়ে রইল। এমনকি সাংবাদিকেরাও মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন! কলকাতায় ফরাসি কনসুলেটের কাছে দু-একজন ফরাসি ও ‘জ্য সুই শার্লি’ লেখা পোস্টার হাতে দু-একজন খুদেকে দেখা গিয়েছিল। বোঝা গেল– ভোটবাক্স বড় বালাই। বানতলায় অনীতা দেওয়ান হত্যাকাণ্ডে যেমন চুপ করে ছিলাম, এখনও নীরবতা পালনের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিলাম। ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে ভারত নামে দেশটা আদতে ধর্মলেহী বা ধর্মজীবীই।

আশা যাক নিজেদের সাংগঠনিক কথায়। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতাও সুচারুভাবে হল। বক্তা ছিলেন বোলান গঙ্গোপাধ্যায়। ‘অসংগঠিত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই’– গোটা দেশের প্রেক্ষিতেই তথ্যনিষ্ঠ ও পর্যবেক্ষণলব্ধ যে ছবিটা তুলে ধরলেন বোলানদি, তাকে চমৎকার বলা হয়ত ঠিক হবে না, বলা ভাল দুর্ভাবনার, উৎকণ্ঠার। স্মারক বক্তৃতার আগে গান শুনিয়েছেন সুকণ্ঠী সঞ্চিতা রায়চৌধুরি। কাজী নজরুলের দুটি প্রাসঙ্গিক কবিতা আবৃত্তি করেছেন রণেন্দ্রনাথ ধাড়া। ওঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বইমেলায় এবারেও থাকছি। স্টল নং ৪৮৯। বন্ধু-অবন্ধু, শুভানুধ্যায়ী সবার সঙ্গেই দেখা হবে।

আ•হ•র•ণ

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের দার্শনিক ঐতিহ্য

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১.

দর্শনের সঙ্গে কখনও কখনও রাজনীতির সরাসরি যোগ থাকে— এই তথ্য রবীন্দ্রনাথের চোখে একবার হঠাৎ আলোর মতো ঝলকে উঠেছিল। সেই ঘটনাটি দিয়েই শুরু করছি।

১৯৩২-এর কথা। তখনকার দিনে বিমানে যাতায়াত আজকের মতো ছিল না। পারস্য, অর্থাৎ বর্তমান ইরান থেকে এল কবির আমন্ত্রণ। ব্যবস্থা হল বিমানে যাওয়ার। এটি তাঁর দ্বিতীয় বিমানভ্রমণের অভিজ্ঞতা, এর আগের বার লন্ডন থেকে পারী অবধি ছোট্ট একটু পথ গিয়েছিলেন।

পারস্যে যাওয়ার পথে কবিকে তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বাগদাদে নামতে হয়। সেখানে তিনি শুনলেন যে ব্রিটিশ বিমানবাহিনী কিছু বিরোধী শেখের গ্রামে নিয়মিত বোমা ফেলে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত! তাঁর কাছে এ হল নিছকই হত্যা আর ধ্বংস। অথচ কী সহজ! অপরাধী-নিরপরাধ, পুরুষ-নারী শিশু নির্বিশেষে মানুষ মারা মানুষের পক্ষে কী অবিশ্বাস্য রকমের সহজ। শুধুমাত্র ভূ-পৃষ্ঠের বহু উঁচু থেকে কিছু অস্ত্র-ক্ষেপ! যে উচ্চতায় পৌঁছলে বস্তুজগৎ বিলীন হয়ে যায়, আর সেইসঙ্গে মুছে যায় তার যাবতীয় ভেদাভেদ বোধ।

আপাতদৃষ্টিতে, উঁচুতে ওঠার কৌশল আয়ত্ত করার মধ্যেই এমন একটা কিছু ছিল যাতে এই অমানবিক কাজ মানুষের কাছে খুব সহজ হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব গভীরভাবে ভাবলেন এবং নিজের বিমানভ্রমণের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা ব্যাপারটা বুঝতে চাইলেন। এই ধারার চিন্তা থেকেই এল শূন্যমার্গলাভের আরেকটি পদ্ধতির পুনর্বিচারের চিন্তা। সেটি হলো আধিবিদ্যক ('মেটাফিজিক্যাল') দূরকল্পনায় মুক্তপক্ষ বিচরণের পদ্ধতি। নাটকীয়ভাবে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল দীর্ঘসমাদৃত কতকগুলি দার্শনিক মতবাদ— বিশেষত যেগুলি জগতের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে— তার রাজনৈতিক কার্যকারিতা।

এবার আমরা এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা অনুসরণ করার চেষ্টা করব। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: ''বায়ুতরী যতই উপরে উঠল ততই ধরণীর সঙ্গে আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের যোগ সংকীর্ণ হয়ে একটা মাত্র ইন্দ্রিয় এসে ঠেকল, দর্শন ইন্দ্রিয়ে, তাও ঘনিষ্ঠভাবে নয়। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে-পৃথিবীকে বিচিত্র ও নিশ্চিত করে জেনেছিলুম সে ক্রমে এল ক্ষীণ হয়ে, যা ছিল তিন আয়তনের বাস্তবে তা হয়ে এল এক আয়তনের ছবি। সংহত দেশকালের বিশেষ বিশেষ কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ রূপ। তার সীমানা যতই অনির্দিষ্ট হতে থাকে, সৃষ্টি ততই চলে বিলীনতার দিকে। সেই বিলয়ের ভূমিকার মধ্যে দেখা গেল পৃথিবীকে, তার সত্তা হলো অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবি এল কমে। মনে হলো, এমন অবস্থায় আকাশযানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বেরোয় তখন সে নির্মমভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, যাদের মারে তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না, কেন-না, হিসাবের অঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে যায়। যে-বাস্তবের 'পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশেও এই রকমের উড়োজাহাজ, অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল সেখান থেকে দেখলে মারেই-বা কে, মরেই-বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়োজাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।'

কয়েকটি বিশেষ ধারার দর্শনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অত্যন্ত ক্ষতিকর কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দেখতে পেয়েছিলেন, এই সরল সত্যটি উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়। এ-সবের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন শুধুই অশুভ আর

হত্যা। তাঁর মনে হয়েছিল মানুষের বিবেকবিরুদ্ধ আচরণ ছাড়া এগুলো আর কিছুই নয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন এই কথাগুলো লিখছেন তখন তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়েছে। আর দশবছরও তিনি বাঁচেননি। সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শগত বন্ধ্যাত্ব, মনোহীনতার সঙ্গে নৃশংসতার সমন্বয়ই যার মূল কথা, তাকে তিনি কী চোখে দেখতেন সে-কথা জানতে ইচ্ছে করে। হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বর্ষণের সংবাদেই বা কী হতো তাঁর প্রতিক্রিয়া? বিশেষত যখন জাপানের রাজনৈতিক ও সামরিক পতন আসন্ন, আর তাই এই নিরপরাধ পুরুষ-নারী-শিশুদের উদ্দেশ্যহীন হত্যার একেবারেই কোনো প্রয়োজন ছিল না। যাই হোক, কবির যে-কথা এইমাত্র উদ্ধৃত করা হল, তা থেকে আমরা বোধহয় কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি। যে বৈমানিকরা পারমাণবিক বোমাটি ফেলেন তাঁদের কাছে ব্যাপারটি সম্ভবত সামান্য কয়েকটি বোতাম টেপার মতোই তুচ্ছ। কিন্তু কতজন নিরপরাধ মানুষ যে এই সামান্য কাজটির ফলে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সেই সংখ্যাটা জানা থাকলে কি আর তাঁরা এই কাজটা সত্যিই অত সহজে করতে পারতেন? আসলে, এই প্রশ্নটিই, মনে হয়, তাঁদের কাছে অতটা গুরুত্ব পায় নি। কেননা এত উঁচু শূন্যমার্গে তখন তাঁদের বিচরণ যে রক্তমাংসের নারী-শিশু-পুরুষদের তাঁরা দেখতেই পাচ্ছিলেন না। নিঃসন্দেহে, গোটা ব্যাপারটার বিরুদ্ধে উঠেছিল তীব্র প্রতিবাদ। পারমাণবিক বোমার প্রধান নির্মাতা ওপেনহাইমারকে লেখা একটি খোলা চিঠিতে জীববিজ্ঞানী থিওডোর হাউস্কা বলেছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের প্রতিপত্তির প্রধান কারণ হলো, ''তাঁরা মৃত্যুর প্রতিভাধর সহযোগী হয়ে উঠেছেন।'' কিন্তু ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে ওপেনহাইমারের কিছুটা জ্ঞান ছিল। তাই তিনি সম্ভবত ব্যাপারটায় কোন নতুনত্ব খুঁজে পান নি। শোনা যায়, প্রথম পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে নির্গত ভয়ংকর ও বিশাল ধোঁয়ার মেঘ দেখতে দেখতে তিনি নাকি আবৃত্তি করেছিলেন অর্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, ''আমিই লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল,'' কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো (গীতা, ১১।৩২)। তাহলে এইভাবে আমরা আবার মৃত্যু এবং 'গীতা'য় প্রচারিত দর্শন প্রসঙ্গে ফিরে গেলাম, রবীন্দ্রনাথ যার কথা আগেই বলেছেন।

ওপেনহাইমার ও পারমাণবিক বোমার কথা থাক। আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করা।

'গীতা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রচলিত মত বলতে শুধুমাত্র গোঁড়া হিন্দুদের মতই নয়, 'গীতা' সম্পর্কে দেশের বহু স্বনামধন্য নেতার— যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, টিলক, অরবিন্দ এবং গান্ধী প্রভৃতির— দৃষ্টিভঙ্গীরও তা বিরোধী। কিন্তু এটাই সব নয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা কেন তাঁর সমসাময়িক বহু লোকের কাছে— যার মধ্যে কবির কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গীও ছিলেন— আতঙ্কজনক মনে হয়েছিল, সেটা বোঝা দরকার। কবি তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে যে সংস্কৃত চরণটি ব্যবহার করেছেন— 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'— সেটি 'ভগবদ্গীতা'য় আছে বলেই লোকে সাধারণত জানে। কথাটা ঠিক, কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। শ্লোকটি আসলে 'কঠ-উপনিষদ্' থেকে 'ভগবদ্গীতা'য় উদ্ধৃত হয়েছে। 'কঠ-উপনিষদ্'-এর আসল চরণগুলি হল:

''ব্রহ্মের (অর্থাৎ আত্মার) জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। এই আত্মা কারণান্তর হইতে উদ্ভূত হন নাই, ইহা হইতেও কিছু উৎপন্ন হয় না। এই আত্মা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর নিহত হইলেও তাঁহার নাশ হয় না।

হননকারী যদি মনে করে যে, (আত্মাকে) হত্যা করিব, বা হত ব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি হত হইয়াছি, তবে উভয়েই অজ্ঞ। কেননা উক্ত আত্মা কাহাকেও হত্যা করে না বা নিজেও হত হন না।''

'ভগবদ্গীতা'য় (২।১৯-২০) কঠ-উপনিষদ্'-এর (২।১৮-১৯) শ্লোক দুটি প্রায় অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধৃত হয়েছে।

উপনিষদের যে কোন পাঠকের কাছেই এই অংশটি খুব বিখ্যাত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিছক উপনিষদের পাঠকের চেয়ে অনেক বেশি। একথা সবাই জানেন যে আকৈশোর তিনি উপনিষদ্ পাঠে আক্ষরিক অর্থেই মগ্ন থেকেছেন। সুতরাং, যে কোনো ভাবেই হোক তিনি তাঁর বক্তব্যের ইঙ্গিত সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না— এ কথা ভাবা একেবারেই অসম্ভব। তিনি আসলে একটি উপনিষদীয় ধারণার প্রতিই ইঙ্গিত করছেন, 'গীতা'য় সেটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

এর সঙ্গে আরও একটা ছোট্ট কথা বলা দরকার। দার্শনিক সঙ্গতির প্রশ্নটিও এই প্রসঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। অর্থাৎ, অন্য ভাবে বললে, দেহের বিনাশ হলে আত্মার বিনাশ হয় না, এই বক্তব্যে প্রচারিত মূল ধারণাটি খোদ উপনিষদের কোন বিচ্ছিন্ন বা খাপছাড়া চিন্তার নিদর্শন নয়। এটি যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক তাকে খুব কেটে ছেঁটে না নিলে— বা এমনকি পুরোপুরি অস্বীকার না করলে— দেহ-আত্মার সম্পর্ককে বাতিল করা অসম্ভব।

এই দর্শন তাহলে কী?

এই দর্শন হল বিশুদ্ধ আত্মা বা বিশুদ্ধ সত্তাকেই সত্যের

মর্যাদা দেবার দর্শন। তাই, সাময়িক হলেও এই পার্থিব দেহের সঙ্গে এর সম্পর্ককে এক ধরনের বিচ্যুতি বলেই ধরা হয়। আর সেই জন্যেই এই দর্শনের অন্য একনাম দেওয়া হয়েছে ‘শারীরিক’। নামটি স্বতঃপ্রকাশ। ব্যুৎপত্তিগতভাবে, শরীর শব্দের সঙ্গে অপকর্ষ অর্থে কন্ প্রত্যয়যোগে এটি তৈরি। সংক্ষেপে ‘শারীরিক’ মানে হলো বিশুদ্ধ আত্মা, যা সাময়িকভাবে এই কলুষিত দেহে বাস করার ফলে মলিন হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের ভারতীয় দর্শনের একটি শাখা, যা এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী, সেই অদ্বৈত বেদান্ত মতে এ-ই হলো উপনিষদের দর্শন। আর সেইজন্যেই অদ্বৈত বেদান্তের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রবক্তা শঙ্কর তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনার নাম দিয়েছিলেন ‘শারীরিক-ভাষ্য’। এটি আসলে ‘ব্রহ্মসূত্র’ বা ‘বেদান্তসূত্র’-এর একটি ভাষ্য, যাতে উপনিষদের দর্শনকেই সুসংবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অদ্বৈত বেদান্ত বা শারীরিক দর্শনই উপনিষদ্ রচনাবলীর একমাত্র ধারাকে উপস্থাপিত করছে কিনা, তা বর্তমানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। অপরপক্ষে কথাটা হল, ঔপনিষদিক চিন্তাধারায় এর অন্তত একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। বা অন্যভাবে বললে, দেহের বিনাশ হলে আত্মার বিনাশ হয় না—এই ধারণাটি উপনিষদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এইভাবেই এটিকে দেখতে হবে।

‘ভগবদ্গীতা’-য় খুব সুন্দর এবং সহজ রূপকের সাহায্যে স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখ দিয়ে এই দর্শন প্রচার করা হয়েছে। জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন পরিধেয় পরার মতো আত্মাও এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়। রবীন্দ্রনাথ যে অন্তত কবি হিসেবে এমন চমৎকার একটি সাহিত্যিক কৌশলের কদর করবেন, এটাই প্রত্যাশিত। অবশ্য, মৌল মানবিকতাই যেখানে প্রত্যক্ষত ভ্রষ্ট, সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে, সম্ভবত, এই ধরনের সাহিত্যিক সৌন্দর্যের দিকে মন দেবার মতো মানসিক স্থৈর্য কবির ছিল না। বরং এই দর্শন কী কদর্য সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারে, সে কথা ভেবে তিনি আতঙ্কিত হয়েছিলেন। আর তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদীদের মতাদর্শগত অস্ত্রশালার বহু অস্ত্র এবং সমাজনীতি ও ধর্মের বহু তত্ত্ব সমানভাবেই এই কদর্যতার অংশীদার।

কিন্তু এটাই সব নয়। কবি বুঝেছিলেন যে এই সমস্ত তত্ত্বের মূলেই আছে একটা ছোট্ট চালাকি। সেই চালাকি হল সত্যকে গোপন করার চালাকি। চিন্তাকে এমন এক আধিবিদ্যক উচ্চতায় পৌঁছতে প্রলোভিত করা যেখানে পৌঁছলে বস্তুজগতের অনুভূত সত্তা যায় মুছে।

আসলে, এখানে যা বলা হচ্ছে, আধুনিক বস্তুবাদী বা বিপ্লবীও সেই একই কথা বলেন, যদিও তিনি বলেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে, নিজস্ব পরিভাষায়। পরিভাষার গুরুত্ব কম নয়। বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্যের প্রশ্নে শিথিল প্রকাশভঙ্গি এড়িয়ে যাওয়াই উচিত, কারণ অধিকাংশক্ষেত্রেই তা অল্পাধিক বিভ্রান্তিকর হয়। কিন্তু তার মানে আবার এই নয় যে মূল চিন্তনীয় বিষয়ের চেয়ে পরিভাষাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরিভাষা আসলে মূল চিন্তাপ্রকাশের বাহকমাত্র। সুতরাং কবি যে ভাবেই তাঁর চিন্তা প্রকাশ করে থাকুন না কেন, এখানে আসলে আমাদের কাছে যা জরুরি, তা হল তাঁর চিন্তাধারা। আর খুব কম করে বললেও উদ্ধৃত অংশের চিন্তাধারাটি আমাদের অবাক করে, কারণ তা বর্তমান যুগের বস্তুবাদী ও বিপ্লবীদের ধ্যানধারণার খুব কাছাকাছি।

এ কথা নিশ্চয়ই বলতে হবে না যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক অর্থে বিপ্লবী বা বস্তুবাদী কোনোটাই ছিলেন না। বরং এ দুয়ের থেকেই অনেক দূরে ছিল তাঁর অবস্থান। আমার কাছে তাঁর রচনাসংগ্রহ রয়েছে। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা দশহাজারেরও বেশি, আর ছাপাও বেশ ঠাসা। এই রচনাবলীর সঙ্গে আমি বেশ পরিচিত। আমি তাঁর পারিবারিক পটভূমির কথা জানি এবং যে মননের পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছেন তার কথাও জানি। গভীর আন্তর্জাতিকতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর ওপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ছিল এবং এই আন্দোলনে ছিল তাঁর নিজস্ব অবদান, সে সম্পর্কেও আমি সচেতন। এ ছাড়াও ইওরোপীয় সভ্যতার কাছে, বিশেষত উনিশ শতকের ইংলন্ডের উদারনীতির কাছে, তাঁর ছিল বিরাট প্রত্যাশা। শেষ জীবনে অবশ্য তিনি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হয়েছিলেন। এই সমস্ত কারণে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার চেহারাটি হয়েছিল খুবই জটিল। এ সম্পর্কে কোন নির্বিশেষ মত পোষণ করলে তা খুবই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তাই, রবীন্দ্রনাথের দর্শন নিয়ে যাঁরা লেখালিখি করেন তাঁদের সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। কবির যাবতীয় কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, আলোচনা ও ভাষণ সবকিছুর মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পান একটি সংহত দৃষ্টিভঙ্গি। আমি নিজে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যতটুকু পড়েছি বা জেনেছি, তার থেকে সাধারণভাবে স্বীকৃত অর্থে কোনো সুসংবদ্ধ দর্শন খাড়া করতে আমি একটু ভয় পাই। এই জাতীয় কোন প্রবণতাকে কবি নিজে সত্যিই কতটা সমর্থন করতেন সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই। ‘সভ্যতার সংকট’ নামে প্রকাশিত, ১৯৪১-এ তাঁর শেষ জন্মদিনের বাণীটি তিনি শুরুই করেছিলেন নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপক পরিবর্তন সম্বন্ধে একটি মন্তব্য দিয়ে:

‘আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতন দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে; সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।’

কবির নিজের উপলব্ধিতে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা না বুঝে তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করার কোন মানেই হয় না। কিন্তু কোনভাবেই তার অর্থ এই নয় যে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটি মৌলিক তথ্যকে কোনরকমে সন্দেহ বা অস্বীকার করা যায়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে এক ধার্মিক ব্যক্তি। আর বিশেষ করে তাঁর জীবনের গোড়ার দিকে ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রতি তিনি ছিলেন তীব্রভাবে অনুরক্ত এবং ঔপনিষদিক শিক্ষায় সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত। ঠিক এইজন্যেই তাঁর যে কথা আমরা উদ্ধৃত করেছি তা এত অসাধারণ। পছন্দ হ’ক বা না হ’ক, এ ধরনের কথা কেবলমাত্র বিপ্লবী বা বস্তুবাদীদের কাছ থেকেই লোকে আশা করে। রবীন্দ্রনাথ যে এমন কথা বলবেন এটা কেউ আশা করে না।

তবুও, একথা কোনভাবেই এড়ান যায় না যে, এই সর্বতোভাবে ধার্মিক মানুষটি— ঔপনিষদিক জ্ঞানের প্রবক্তা হিসেবে যাঁকে স্মরণ করা অযৌক্তিক নয়— বৃদ্ধ বয়সে এমন এক চিন্তাধারা প্রকাশ করলেন যা তাঁর আগের ঔপনিষদিক বিশ্বাসকে প্রায় পুরোপুরি অভিযুক্ত করেছে বলে মনে হয়। কথাটা যে পুরোপুরি সত্যি নয় সেটা আমরা একটু পরেই দেখতে পাব। এমনকি তাঁর জীবনের শেষ দশবছরে লক্ষণীয় র‍্যাডিকাল প্রবণতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ঔপনিষদিক বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে দেননি। কিন্তু আমরা এও দেখব যে কী বন্ধুর ও কষ্টকর পথে তিনি তাঁর নতুন চেতনা আর পুরনো বিশ্বাসের মধ্যে একটা কাজ-চালানো গোছের বোঝাপড়ায় আসতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের যে কথা আমরা উদ্ধৃত করেছি তার সঙ্গে কবির বাকি জীবনধারা ও শিক্ষাকে রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞরা যে কী করে মেলান তা আমি জানি না। আমি অবশ্য এইটুকু জানি যে রবীন্দ্রনাথের দর্শন নিয়ে যাঁরা লেখালিখি করেন, তাঁরা সাধারণত আমরা যে অংশটুকু উদ্ধৃত করেছি সেটা এড়িয়েই যেতে চান। এই অংশটুকু ঢেকে রাখা হয় একটা নৈঃশব্দের আবরণে। যেন এটি একধরনের কাব্যিক বিচ্যুতি, অথবা, শান্তিনিকেতন আশ্রমের ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন গুরুদেবের হঠাৎ কোন খামখেয়াল। অবশ্য এরকম অগভীরভাবে ব্যাপারটিকে দেখার কোন মানে হয় না, কারণ তাতে বরং রবীন্দ্রনাথের মননের সংহতিকে অমর্যাদা করা হয়। অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় এই যে, আমরা রবীন্দ্রনাথের যে কথা উদ্ধৃত করেছি সেটি সমেতই তাঁকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তার প্রধান কারণ হল জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর চিন্তাধারা কোন্‌দিকে যাচ্ছিল এটি বোধহয় তার নির্দেশ দেয়।

তা হলে এ সব উক্তি আমরা কীভাবে বুঝব?

রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় বিশ্বাস যথেষ্ট গভীর হলেও তার মূল নিহিত ছিল প্রগাঢ় মানবতার মধ্যে। একটা কথা অবশ্য সত্যি যে বিশেষ করে তাঁর জীবনের প্রথমভাগের— এবং এছাড়াও ‘শান্তিনিকেতন’ শিরোনামে সংগৃহীত তাঁর উপদেশাবলী ও ‘মানুষের ধর্ম’ সংক্রান্ত বক্তৃতামালার— মূল সুর হল এই মানবতাবাদকে ভাববাদী অধিবিদ্যার ভাষায় প্রকাশ করা। মানুষের কথা তিনি যেন বলছিলেন ‘মানুষ’ শব্দটি বড় বড় অক্ষরে লিখে। যেন মানুষ কোন বোধাতীত পর্যায়; কিংবা তার চতুর্দিকে ঢাকা আছে এক রহস্যময় বা প্রায়-রহস্যময় যবনিকা। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে—বা আরও সংক্ষেপে বললে তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে— অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছিল, যার ফলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল মানুষের ওপরকার সেই প্রায়-রহস্যের যবনিকা, আর তাঁর চোখের সামনে এগিয়ে এসেছিল সেই সব লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী নারী-পুরুষ ও শিশু, যুগ যুগ ধরে যাদের দমিয়ে রেখেছে দু-ধরনের পাশব শক্তি— রাজনীতিগত এবং ভাবাদর্শগত। সংক্ষেপে বললে, তাঁর মানবতাবাদে যুক্ত হয়েছিল একটি লক্ষণীয় নতুন মাত্রা। তাঁর এই মানবতাবাদে— বা নতুন মাত্রাযুক্ত মানবতাবাদে— কঠিন আঘাত পড়ল ১৯৩২ সালে, যখন তাঁকে বলা হল পুরুষ-নারী-শিশু নির্বিশেষে, দোষী-নির্দোষ নির্বিচারে চালান হচ্ছে গণহত্যা। এই ধ্বংসকাণ্ডের জন্য দায়ী পাশবশক্তিকে কবি নিন্দা করলেন প্রকাশ্যে। সেইসঙ্গে নিন্দা করলেন সেই দর্শনকে যা এই হত্যাকর্মকে কলুষমুক্ত করতে পারে, এবং বস্তুত করেও।

আমি যেটা বোঝাতে চাইছি তা হল, রবীন্দ্রনাথের ১৯৩২ সালের মন্তব্যটি সঠিকভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু যদি এটিকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা হয় বা প্রকৃত প্রসঙ্গের থেকে আলাদা কোন মন্তব্য বলে ধরা হয়, তাহলে এটিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর চিন্তাধারা যে বাঁক নিচ্ছিল, কেবলমাত্র সেই ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতেই এই মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

শারদীয় পরিচয়, ১৯৮৬

(বাকি অংশ পরের সংখ্যায়)

অসংগঠিত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

আয়োজিত
শোক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মারক বক্তৃতা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন বোলান গঙ্গোপাধ্যায়। জীবনানন্দ সভাঘরে।

প্রথম পর্ব

এই লেখার বিষয়বস্তু শিরোনামেই বলে দেওয়া হয়েছে। 'অসংগঠিত' বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি যে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এবং দলীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এইসব লড়াই সংগঠিত হয়নি। বিভিন্ন জায়গায়, নানাভাবে উৎপীড়িত মানুষ, নিজেদের তাগিদে অর্থাৎ বেঁচে থাকার তাগিদে লড়াই করতে বাধ্য হয়েছে। এবং সেইভাবেই জোটবদ্ধ হয়েছে। মূলত কৃষিজমিকে কেন্দ্র করেই লড়াই শুরু হয়েছে।

এই বিষয়ে লিখতে গেলে, সবচেয়ে প্রথমে আসে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের নাম। সেই আন্দোলনকে চোখের সামনে গড়ে উঠতে দেখেছি। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের আন্দোলন শুরু হয়েছিল একেবারেই সাধারণ মানুষের নিজেদের ক্ষোভ এবং দাবিকে সম্বল করে। পরে নানাভাবে জটিল হয়ে ওঠে সেই আন্দোলন এবং রাজনৈতিক দল যথারীতি নেমে পড়ে ফায়দা তুলতে। আন্দোলন 'হাই জ্যাকড্' হয়ে যায় বললেও অত্যুক্তি হয় না। সারা ভারতবর্ষে নন্দীগ্রামের শহীদরা জমি-আন্দোলনের প্রথম শহীদের মর্যাদা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন। নিজের চোখে মহারাষ্ট্রের গ্রামে দেখে এসেছি নন্দীগ্রামের শহীদদের উদ্দেশ্যে তৈরি শহীদ-বেদি। সেই আন্দোলনকে স্মরণ করে, আমি মহারাষ্ট্র ও ওড়িশায় দেখে আসা কিছু আন্দোলনের অভিজ্ঞতার কথা বলব।

আমার এই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই একটা কথা বলে দেওয়া ভালো যে, যে ঘটনাগুলির কথা আমি বলব, তার অনেকটাই পরিবেশ বাঁচানোর লড়াই। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও জল-জমি-জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল। তাঁদের জীবিকা, জীবনধারণ সবই জল-জমি-জঙ্গলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু নতুন যে ভুবনায়নের হাওয়া উঠেছে, তাতে জল-জমি-জঙ্গলকেই অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নশীল আমাদের দেশের পক্ষে বাজি রেখেছে রাষ্ট্র। সেটা ছত্তিশগড় থেকে ওড়িশা, মহারাষ্ট্র বা পশ্চিমবঙ্গ— সর্বত্র একইরকম। তাই নিজেদের তাগিদে, নিজেদের ক্ষমতায় আস্থা রেখে মানুষ প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছে। সেই প্রতিবাদ, একদিকে যেমন ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর নদী, সমুদ্র, আবহাওয়াকে রক্ষা করার আন্দোলন, অন্যদিকে তেমনই মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার, তার জীবিকা রক্ষার আন্দোলন। একটার সঙ্গে আর একটা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আবার, অন্যরকম আন্দোলনের অভিজ্ঞতাও হয়েছে। যেখানে মানুষ উন্নয়নের নামে ধ্বংসলীলা এবং প্রতারণার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সেজন্য আন্দোলনে সামিল হয়েছে। সর্বত্রই রাষ্ট্রশক্তি তার নখ-দাঁত নিয়ে নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কখনও কখনও কোথাও কোথাও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাহায্য পেয়েছে। অধিকাংশ সময়ই পায় নি। ওড়িশায় দু'টি গ্রামের মানুষ হারিয়ে গেছেন। কারখানা হয় নি। চাকরি তো

দূরস্থ। নিজের চোখে দেখে আসা অভিজ্ঞতা আর জর্জরিত মানুষ, যাঁদের কথা শুনে এসেছি, সেই অভিজ্ঞতাই এই লেখার উপজীব্য।

প্রথমে আসি, ওড়িশার ‘পস্‌কো’ নিয়ে আন্দোলনের কথায়। ওড়িশার উপকূলবর্তী জেলা জগৎসিংহপুরে চার হাজার একর জমিতে স্টিল কারখানা ও নিজস্ব বন্দর (ক্যাপটিভ পোর্ট) করার প্রস্তাব নিয়ে ওড়িশা সরকার ও কোরিয়ার ‘পোহার স্টিল কোম্পানি লিমিটেডে’র মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয় ২০০৫ সালের ২২ জুন। এটিকে প্রস্তাবিত ‘স্পেশাল ইকনমিক জোন’ বা ‘সেজ’ ((ক্ষ্ঠ)-এর অন্তর্ভুক্ত করার কথাও হয়।

জগৎসিংহপুর আয়তনে ওড়িশার সবচেয়ে ছোট জেলা। ১৬৬৮ স্কোয়ার কিলোমিটার। কিন্তু এ’টি ওড়িশার সবচেয়ে সম্পন্ন জেলা। ধান, পান, মাছ— এই তিনটিই জেলাকে সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়া কাজুবাদাম একটি অর্থকরী ফসল। জেলার ৮০ শতাংশ মানুষ ধান, পান, মাছ এবং কাজুবাদামের চাষের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত। ৬০ শতাংশ মানুষের নিজেদের জমি, পানের বরোজ বা কাজুবাদামের বাগান আছে। এবং প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের নিজের বাড়ি আছে।

ভারতের সবচেয়ে বড় বিদেশি লগ্নির প্রস্তাব ‘পস্‌কো’। ১.২ কোটি টনের স্টিল প্ল্যান্ট এবং বন্দরের জন্যই ৪ হাজার একর জমি নির্ধারিত হয়েছে। এর মধ্যে খনি, রাস্তা বা রেললাইনের জন্য যে জমি দরকার হবে তা ধরা হয় নি। ৪ হাজার একর জমি অধিগৃহীত হলে, ৩টি পঞ্চায়েতের ৭টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ঢিনকিয়া, নুয়াগাঁ আর গড়কুজঙ্গপুর— এই তিনটি পঞ্চায়েতের ঢিন্‌কিয়া, নুলিয়াগাই, গড়কুজঙ্গ, অভয়পুর, পাটেনা, পোলাং আর মাথাই গ্রাম। এই গ্রামগুলি ছাড়াও সুন্দরগড় জেলাকেও লৌহখনির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

‘মউ’ স্বাক্ষরিত হবার আগে থেকেই, ওড়িয়া এবং ইংরেজি খবরের কাগজগুলিতে ‘পস্‌কো’ প্রকল্প নিয়ে নানারকম জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফলে, জগৎসিংপুর জেলা জুড়েই, এই প্রকল্প নিয়ে গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে আরম্ভ করেছিল। এর আগে ‘ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড’-এর শোধনাগার আর ‘পারাদ্বীপ ফসফেট লিমিটেড’ প্রয়োজনে জমি দেবার অভিজ্ঞতা এই অঞ্চলের মানুষকে খুব সঙ্গত কারণে ভীত করে তুলেছিল। কারণ জমি দেবার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণের টাকা, চাকরি বা বিকল্প জমি কিছুই অধিকাংশ জন পান নি। ফলে, কোনওরকম প্রকল্পেই আর তাঁরা জমি দেবেন না বলে ঠিক করেন। বিভিন্ন গ্রামে একটি সংগঠন নিজেরাই তৈরি করেন। নাম দেন ‘পস্‌কো ক্ষতিগ্রস্ত সংঘর্ষ সমিতি’ (ঞ্জ্র()। এইখানে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এই সংগঠনে স্থানীয় বি জে ডি (বিজু জনতা দল) পার্টির পঞ্চায়েত সদস্যরা এবং বেশ কিছু বি জে ডি সমর্থক স্থানীয়ভাবে যোগ দেন। যদিও রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলও বি জে ডি। তৃণমূলস্তরে এই আন্দোলন এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, স্থানীয় নেতাদের মুখ রক্ষার জন্যই এই আন্দোলনকে সমর্থন না জানিয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু ৬ মাসের মধ্যেই বি জে ডি-র নেতারা এবং সমর্থকেরা ঞ্জ্র(থেকে সরে দাঁড়ান এবং ‘পস্‌কো’ প্রকল্পের পক্ষে প্রচার চালাতে থাকেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা সেই প্রচারকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি। তাঁদের আন্দোলন চলতে থাকে, রাজনৈতিকভাবে এই অঞ্চলটি সিপিআই-এর সমর্থক। বরাবরই সিপিআই প্রার্থীরাই এখান থেকে ভোটে জিতে এসেছেন। কিন্তু বি জে ডি-র প্র ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে। আন্দোলন শুরুর সময় এখানকার বি জে ডি-র বিধায়ক দামোদর রাউত রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। সি পি আই পার্টি হিসাবে এগিয়ে এসে ‘পস্‌কো’ প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনে কোনও নেতৃত্ব দেয় নি।

মোটামুটিভাবে তিনটি সংগঠন এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছে। (১) ভিটা-মাটি বাঁচাও আন্দোলন, যার নেতৃত্বের রাশ কংগ্রেসের হাতে। (২) নবনির্মাণ সমিতি, যার নেতৃত্বে আছে রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন (এটি সর্বোদয় আন্দোলনের যুব শাখা।) (৩) পস্‌কো প্রতিরোধ সংঘর্ষ সমিতি, এটি মূলত গ্রামবাসীদের দ্বারা তৈরি এবং বেশিরভাগ গ্রামবাসী এই সংগঠনের সক্রিয় কর্মী যদিও এটির নেতৃত্বে আছেন অভয় সাহু। যিনি সি পি আই-এর রাজ্য সম্পাদক। কিন্তু অভয় সাহুর সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি যে তিনি একেবারেই ব্যক্তিগত স্তরে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। পার্টির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। বেশ কয়েকবার অভয় সাহুকে জেলেও যেতে হয়েছে।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে যে, কেবল কৃষিজমি এবং বসতবাটি ধূলিসাৎ হবে বলে তাঁদের আপত্তি, তা নয়। তাছাড়া জটাধারী নদীর মোহনায় ‘পস্‌কো’-র নিজস্ব বন্দর তৈরিরও বিরুদ্ধে। জটাধারী নদীর মাছ গোটা ওড়িশাকে কেবল মাছ খাওয়ায় না, সেই মাছ রফতানিও হয়। নদীর মোহনায় যদি বন্দর তৈরি হয় তাহলে মাছের বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই। এবং পাশেই রয়েছে পারাদ্বীপ বন্দর।

সে বন্দরটি ব্যবহার না করে নতুন বন্দর তৈরির যৌক্তিকতা কী? এরও কোনও সদুত্তর তাঁরা পান নি।

২০০৭-এর ১৫ এপ্রিল ওড়িশা সরকার একটি জনশুনানির ব্যবস্থা করেন। এই শুনানির বিষয় ছিল 'পস্কো' প্রকল্পকে ছাড়পত্র দেওয়া। গড়কুজঙ্গপুরে এই শুনানির ব্যবস্থা হয়েছিল। গোটা অঞ্চলটি ওড়িশার মিলিটারি পুলিশ দিয়ে ঘেরা ছিল যাতে গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে সেই শুনানিতে অংশগ্রহণ না করতে পারেন। এরপর ২০০৭-এরই ২১ নভেম্বর জটাধারী নদীতে ড্রেজিং করতে লোক পাঠায় সরকার। গ্রামবাসীরা বাধা দেন। দু'পক্ষের হাতাহাতি মারামারিতে দু'পক্ষেরই কিছু মানুষ আহত হন।

এইখানে উল্লেখ থাক, এই তিন পঞ্চায়েতের কিছু লোক (প্রায় ৩ শতাংশ) পস্কো প্রকল্পের পক্ষেও ছিলেন। এঁদের মৌখিকভাবে পস্কোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে একর প্রতি ১০ লাখ টাকা এবং একজনকে চাকরি দেওয়া হবে। ক্ষতিপূরণের জন্য পস্কোর পক্ষ থেকে বাড়িও করে দেওয়া হবে।

টিন্‌কিয়া গ্রামের ৫২টি পরিবারে ২৭০ জন মানুষ গ্রামের বাইরে পস্কোর তৈরি কলোনিতে বাস করছেন। এই পরিবারগুলি পস্কো প্রকল্পের সমর্থক। গ্রামবাসীদের আন্দোলনে সামিল হন নি। এই নিয়ে বিবাদে তাঁরা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। গ্রামবাসীরা বলেন এই পরিবারগুলি যে কোনওরকম আন্দোলনের কর্মসূচি সরকারকে আগে থেকে জানিয়ে দিত এবং সরকার পুলিশ পাঠিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি বাতিল করে দিত। সেই নিয়ে বিবাদের জেরে ওঁদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওঁরা বলেন যে, ওঁরা 'পস্কো'র সমর্থক কারণ সরকার অনেক বেশি শক্তিশালী এবং সবচেয়ে বড় বিদেশি বিনিয়োগের এই প্রকল্প থেকে দরদস্তুর করে নিজেদের ক্ষতিপূরণের আর্থিক মূল্যটা বাড়িয়ে নেওয়া অনেক বেশি লাভজনক। যাই হোক, গ্রাম-ছাড়া এই ৫২টি পরিবারকে 'পস্কো'-র পক্ষ থেকে এক ঘরের কলোনি করে দেওয়া হয়েছে এবং সরকার থেকে দৈনিক ৪ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে খাই-খরচ হিসাবে। যৌথ রান্নাঘরে সেই টাকা দিয়ে রান্না করা হয়। কিন্তু গ্রাম-ছাড়া হয়ে থাকতে এঁদের কারওরই ভালো লাগে না। এই কথাটা বারবার বলেন।

এই অল্প কিছু মানুষ ছাড়া, প্রতিটি গ্রামবাসী, নারী, পুরুষ, বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকলেই প্রতিবাদে সামিল। কোনও সরকারী বা 'পসকো'র আধিকারিক গ্রামে এলেই পিকেটিং, মিছিল, ঘেরাও, পস্কো বিরোধী মিছিল চলতেই থাকে।

২০০৮-এর আগস্টে সুপ্রিম কোর্ট ওড়িশা সরকারকে 'পসকো' নিয়ে এগিয়ে যেতে বলে। আন্দোলনও তুঙ্গে ওঠে। ১২ অক্টোবর অভয় সাহু গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে ২৫টি ক্রিমিন্যাল কেস দেওয়া হয়। গোটা ওড়িশা এবং ওড়িশার বাইরের অন্যান্য রাজ্য থেকে সমর্থন এবং সহমর্মিতার জোরে নতুন করে আন্দোলন দানা বাঁধে।

'পস্কো প্রতিরোধ সংঘর্ষ সমিতি'র পক্ষ থেকে ওড়িশা সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে চাওয়া হয়। কিন্তু সরকার রাজি হয় না। বি জে ডি-র লোক আন্দোলনের ভিতর ঢুকিয়ে আন্দোলনকে ভিতর থেকে ভেঙে দেবার একটা চেষ্টা সরকার চালাতে থাকে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নি। অঞ্চলে ঢোকা-বেরনোর মুখে আন্দোলনকারীদের নজরদারি ছিল খুব সতর্ক। শেষে একটি স্থায়ী ধর্ণা-মঞ্চ এই তিনটি পঞ্চায়েত এলাকায় ঢোকার মুখে বানানো হয়। সেই ধর্ণা-মঞ্চে দিবারাত্র গ্রামবাসীরা পাহারায় থাকতেন।

এই তিনটি পঞ্চায়েতের সব গ্রামের সম্পন্নতা বা আর্থিক সঙ্গতি সমান নয়, বলাই বাহুল্য। নুলিয়াসাহী গ্রাম দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। গ্রামে কোনও বেকার নেই। এমনকী, বয়স্কা বিধবাও মাছ শুকনোর কাজ করে রোজগার করেন। সব গ্রামবাসীর নিজের জমি বা পানের বরোজ, সেই সঙ্গে প্রায় সবারই নিজের বাড়ি। অধিকাংশ বাড়িতে নিজেদের গরু আছে। একজন কেবল সরকারি মৎস্যবিভাগে চাকরি করেন। অন্যরা সকলেই চাষ (কাজু এবং ধান ও পান) করেন। আর আছে মাছ ধরা, মাছ শুঁটকি করার ব্যবসা। আবার পোলাং গ্রামের অধিকাংশ মানুষ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা থেকে এসেছেন। এঁরা বসত-জমির পাট্টা পান নি। গ্রামটি ভাগচাষী, জেলে এবং দিন-মজুরদের গ্রাম। অধিকাংশের নিজেদের চাষযোগ্য জমি নেই, অন্যান্য গ্রামে কাজ করতে যান। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা সকলেরই একরকম।

জেলা প্রশাসন বারবার রাস্তা বা গ্রাম অবরোধের নিন্দা করেছেন। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কেস হয়েছে নানা ধারায়। কিন্তু তাঁদের দমে যাবার কোনও লক্ষণ নেই। সরকার আন্দোলনকে ভিতর থেকে ভেঙে দেবার বা কমজোরি করার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। কিন্তু গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দৃঢ়তার সঙ্গে সংকল্পে স্থির।

পুনঃ – বোলান গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মারক বক্তৃতাটিকে কয়েকটি কিস্তিতে প্রকাশ করা হবে। এবার প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হল।

উমা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা ২০১৪

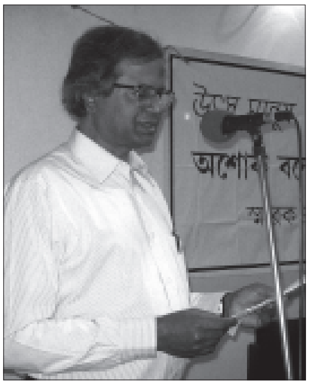
উৎস মানুষ
অশোক
স্মারক

প্রারম্ভিক কথনে শ্যামল ভদ্র

প্রশ্নোত্তর পর্বে
বোলান
গঙ্গোপাধ্যায়

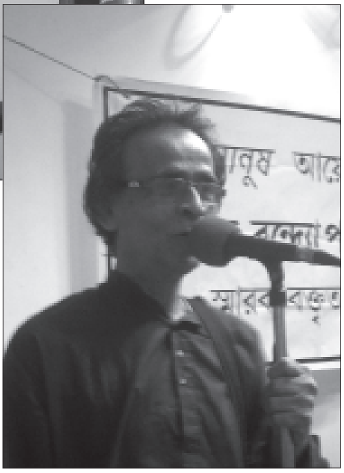
মানুষ
স্মারক বক্তৃতা

আবৃত্তি করছেন রণেন্দ্রনাথ ধাড়া

উৎস মানুষ
অশোক
স্মারক

পাঠে পারমিতা দত্ত

উৎস মানুষ
অশোক ব
স্মারক

সঙ্গীতে সঞ্চিতা রায়চৌধুরি

শ্রোতারা

প্রসঙ্গ: অত্যাধুনিক চার প্রযুক্তি

শংকর ঘটক

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ চিরকালের মতো তাঁর সবচাইতে প্রিয় বাসস্থান শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় চলে আসেন। আসার আগে ওখানে যে ঘরটিতে থাকতেন, সেটি দেখার সুযোগ হয়েছিল। ডি পেনিং-এর পেটেন্ট নেওয়া যন্ত্র, যেটি ভারতীয় পেটেন্ট অফিসের প্রথম পেটেন্ট, টাঙানো আছে সেই ঘরে। দড়িটানা পাখা। মুগ্ধ চোখে পাখাটি দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, তখন কি বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না? রবীন্দ্রনাথ তাহলে কি রাতের বেলায় গ্যাস বা তেলের আলোয় লিখতেন? এর পরে পরেই শুরু বিশ্ব ইতিহাসের চিরকলঙ্কিত অধ্যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, জীবনযাত্রার মান, দর্শন-দিশা, সবকিছুরই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। প্রতিরক্ষা বা যুদ্ধ করার জন্য গবেষণা যেমন নানা ধরনের মারণাস্ত্রের জন্ম দিল, তেমনই জন্ম হল অসংখ্য জীবনযাত্রা সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং প্রক্রিয়ার।

মাসিক ৫ টাকা বেতনে বিপদসঙ্কুল, দুর্গম পথ পেরিয়ে সংবাদ বয়ে নিয়ে যাওয়া ‘ডাকহরকরা’-কে (১৮০৪) সরিয়ে তাঁর জায়গায় এল বৈদ্যুতিন সংবাদ প্রেরণ পদ্ধতি। অক্টোবর ২০১২-র একটি সংবাদ: সুনীতা উইলিয়ামস স্পেস স্টেশনে। ওঁর আইসক্রিম আর চকোলেট খাবার ইচ্ছে হল। তা মুহূর্তে জেনে গেলেন নাসার বিজ্ঞানীরা। সুনীতার ইচ্ছাপূরণের ব্যবস্থাও হল। এই অভাবনীয় উন্নতির ইতিহাস কিন্তু খুব পুরনো নয়। বিগত ৫০ বা টেনেটুনে ১০০ বছরের বেশি নয়। মানবসভ্যতার সামগ্রিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সময়কালটি বিন্দুবৎ।

বিগত একশো বছরে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গতি এতটাই বেশি, যা ধারণ করার মতো সামাজিক ক্ষেত্র প্রস্তুত কিনা ভাববার বিষয়। অনেক কিছুর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার তো উপকারের বদলে ক্ষতি করতেও পারে। যেমন, মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তি। আমাদের যথেষ্ট শিক্ষিত ও সচেতন হতে হবে প্রযুক্তির দান গ্রহণ করার জন্য। এই কথাটি বিবেচনার মধ্যে রেখে বর্তমান বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত, যার ক্রমাগত পরিবর্তিত রূপ বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্র। উদাহরণ অনেক। কয়েকটি যন্ত্র আবার একেবারেই হাল আমলের আবিষ্কার। যেমন ধরুন, ঘড়ি। এটি প্রাচীন যন্ত্র। মিশর ও চীনে আবিষ্কৃত সূর্যঘড়ি (খ্রিঃপূঃ ২০০০) এবং গ্রিসে আবিষ্কৃত জলঘড়ি (খ্রিঃপূঃ ৩০০) থেকে যাত্রা শুরু করে, যান্ত্রিক ঘড়ির (খ্রিঃ ১২৭৫) যুগ পেরিয়ে এসেছে কোয়ার্টজ ঘড়ি (খ্রিঃ ১৯৬৯)। কোয়ার্টজ ঘড়ি শুরু থেকেই জনপ্রিয়। কারণ এর অনেক সুবিধা। প্রথমত, রোজ দম দিতে হয় না, সময়ও দেয় নির্ভুল। এই জাতীয় ঘড়ির জন্মভ্রূণ কিন্তু সৃষ্ট হয়েছিল ১৮৮০-তে কুরি ভ্রাতৃদ্বয়ের (পিরি এবং পল) হাতে। এঁরা দেখালেন,

> “
> বিগত একশো বছরে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গতি এতটাই বেশি, যা ধারণ করার মতো সামাজিক ক্ষেত্র প্রস্তুত কিনা ভাববার বিষয়। অনেক কিছুর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার তো উপকারের বদলে ক্ষতি করতেও পারে। যেমন, মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তি। আমাদের যথেষ্ট শিক্ষিত ও সচেতন হতে হবে প্রযুক্তির দান গ্রহণ করার জন্য।
> ”

কোয়ার্টজ কেলাসের এক চমকপ্রদ আচরণ (পরে দেখা গেছে আরো অনেক পদার্থও একই আচরণ করে, এদের সামগ্রিকভাবে বলে পিজো-ইলেক্‌ট্রিক কেলাস বা ক্রিস্টাল)। এ জাতীয় কেলাসের দুটি বিপরীত তলে যান্ত্রিক শক্তি (চাপ, আঘাত ইত্যাদি) প্রয়োগ করে কেলাসটিকে সঙ্কোচনের চেষ্টা করলে বিদ্যুৎ বিভবের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সঙ্কোচনের দরুণ কেলাসটি ব্যাটারির মতো আচরণ করে। এর বিপরীত প্রক্রিয়ায় কেলাসটির দুটি তলে তড়িৎ বিভব প্রয়োগ করলে কেলাসটিতে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন হয়। কোয়ার্টজ কেলাসের ক্ষেত্রে এই কম্পাঙ্কের সংখ্যা সেকেন্ডে ৩২,৭৬৮ বার। এই ধর্মটিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে আধুনিক কোয়ার্টজ ঘড়ি। যান্ত্রিক শক্তিতে যে যন্ত্র চলত, তা চলছে তড়িৎশক্তিতে। সভ্যতার অগ্রগতিতে শক্তির এক বিশাল ভূমিকা।

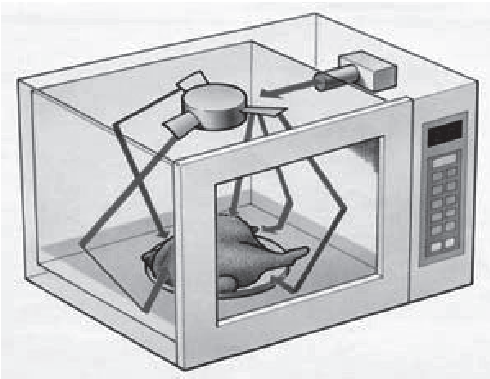

ব্যবহার্য শক্তির বিবর্তন: আগুনের অন্যতম প্রথম ব্যবহার খাদ্যবস্তুকে সহজপাচ্য করে নেওয়া। বিশেষত অমিষ জাতীয় খাবারকে। মানবসভ্যতার প্রথম জ্বালানি গাছের শুকনো পাতা আর গাছ (খ্রিঃ পূঃ ৬০০০ বছর আগে থেকে)। এই পদ্ধতি কমবেশি সবদেশেই এখনো প্রচলিত। অনেক পরে এল কয়লা (খ্রিঃ পূঃ ১০০০, চীন) এবং খনিজ তেল (খ্রিঃপূঃ ৪৫০, ব্যাবিলনের তৈলকূপ)। আলেকজান্ডার খ্রিঃপূঃ ৪৫০-এ পেট্রোলিয়ামের বাতি ব্যবহার করেছিলেন। ক্যাস্পিয়ন সাগরতীরে। মার্কো পোলো ১২৭৩-এ খনিজ তেলের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করেন।

আধুনিক সভ্যতার বিকাশে যে শক্তির কথা বুঝি, সেই বিদ্যুতের প্রযুক্তির উদ্ভব হয়েছে অনেক পরে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাটারি উৎপাদন শুরু হয়। বাণিজ্যিকভাবে প্রথম ডি সি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে শুরু করে ১৮৮৯ সালে এবং এ সি উৎ পাদন ও সরবরাহ শুরু হয় ১৮৯৫ সালে। ভারতে বিদ্যুদয়ন হয়েছিল অনেক পরে, বেঙ্গালুরুতে ১৯০৬ এবং কলকাতায় ১৯২৩-এ।

এই হচ্ছে জ্বালানি ও শক্তির ইতিবৃত্ত। বর্তমান বিশ্বে মূল জ্বালানি খনিজ তেল এবং কয়লা। পরিশোধিত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় নানান পদ্ধতিতে অন্য শক্তি থেকে রূপান্তরের মাধ্যমে। একটু বিস্তারে গেলে বলতে হয়, বিশ্বের শক্তির ভাণ্ডার মোটামুটি দু ধরনের। লক্ষ হাজার বছর ধরে সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া রাসায়নিক শক্তির ভাণ্ডার— কাঠ, কয়লা বা খনিজ তেল, যা আজ শেষ হতে বসেছে। আর আছে পৃথিবীর নিজস্ব পারমাণবিক শক্তির সঞ্চয়, যার পরিমাণ অসীম নয়। এ ছাড়া বায়ুপ্রবাহ বা জলপ্রবাহ থেকে কিছুটা শক্তি আহরণ করাও সম্ভব। এইসব শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিবর্তিত করে সেই শক্তিই মূলত আজ সভ্যতার প্রাণভ্রমর। অতএব শক্তির সংরক্ষণ আজ অত্যন্ত জরুরি এবং সেকথা মনে রেখেই নানাবিধ যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হচ্ছে। দেখা গেছে, টেলিফোনের যন্ত্র চালাতে ঠিক যতটা শক্তির প্রয়োজন, কার্যক্ষেত্রে তার থেকে বেশি শক্তি খরচ হয়। এই বাড়তি খরচ শক্তির অপচয়। শক্তি সংরক্ষণের মূল জায়গাটা অপচয় কমানো। এই মূল সমস্যাটিকে মাথায় রেখে বহু যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, এখনো হয়ে চলেছে। তার থেকেই কয়েকটি যন্ত্র নিয়ে আলোচনা।

১. তাপোৎপাদক যন্ত্র (আভেন): আধুনিক গৃহস্থালির জ্বালানি হয় গ্যাস কিংবা বিদ্যুৎ। এখানে তড়িৎশক্তি ব্যবহারকারী যন্ত্রের কথাই ধরা যাক। প্রথমেই যে যন্ত্রের কথা মনে আসে সেটা হল, সাধারণ তড়িৎ চুল্লি। এই ব্যবস্থায় যে কোনো ধাতব তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করলে তারটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই নীতিকে কাজে লাগিয়ে যে তাপোৎপাদক যন্ত্র তৈরি হয় তাকে সাধারণভাবে ইলেকট্রিক হিটার নামেই চিনি। এখানে উৎপন্ন তাপের অতি অল্প অংশই কাজে লাগে, বাকিটা স্রেফ অপচয়। এ ছাড়াও এ জাতীয় আভেনে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা প্রচুর। এই অসুবিধাগুলো দূর করে যে যন্ত্র তৈরি হল তার নাম মাইক্রোওয়েভ আভেন।

মাইক্রোওয়েভ হল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গের একটা বিস্তৃত পরিসর আছে যার শ্রেণী তরঙ্গটির দৈর্ঘ্য অথবা কম্পনাঙ্কের তারতম্যের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত থাকে। সাধারণ দৃশ্যমান আলোও এই বিভাগে পড়ে। তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের একটি নির্দিষ্ট পরিসরের কম্পাঙ্ক অথবা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের শক্তিকে ব্যবহার করেই বেতার সঞ্চালন, মোবাইল ফোন এবং মাইক্রোওয়েভ আভেনের

কাজ করানো হয়। এই সীমিত পরিসরের কম্পনাঙ্কের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গকেই বলে মাইক্রোওয়েভ।

মাইক্রোওয়েভ আভেনে মাগ্‌নেট্রো নামের একটা যন্ত্র দিয়ে এই বিশেষ তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়। সেই তরঙ্গ খাদ্যবস্তুতে থাকা সমযোগী বন্ধনযুক্ত যৌগ যেমন জল বা হাইড্রোকার্বন অণুকে উত্তেজিত করে। এই আণবিক উত্তেজনার ফলে তাপের উদ্ভব হয়ে রান্নার কাজ সম্পন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে প্রেরিত শক্তি সরাসরি খাদ্যের অণু শোষণ করে। আপাতদৃষ্টিতে এইসব ক্ষেত্রে মূল শক্তির ব্যবহার দক্ষতার সঙ্গে হলেও সামগ্রিকভাবে মাইক্রোওয়েভ আভেন কিন্তু সম্পূর্ণভাবে শক্তি সাশ্রয় করে না। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ সৃষ্টি এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশকে চালু রাখার শক্তিকে ধরলে শক্তি সাশ্রয়ের নিরিখে এ জাতীয় আভেনের দক্ষতা খুব উচ্চমানের নয়। তাছাড়া আভেনের ক্ষতিকারক দিকটার কথা ছেড়েই দিলাম।

মাইক্রোওয়েভের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ভেদশক্তি (পেনিট্রেশন পাওয়ার)। আলোক তরঙ্গ যেমন স্বচ্ছ কাচকে ভেদ করে যায়। এই তরঙ্গও সেরামিক, কাচ এবং পলিমার যৌগের মতো কোনো কোনো পদার্থকে ভেদ করে যেতে পারে। এইসব পদার্থ মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের সাপেক্ষে স্বচ্ছ। আবার কোনো কোনো পদার্থ, যেমন ধাতু, মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে। এগুলোকে বলে মাইক্রোওয়েভ অস্বচ্ছ বা প্রতিফলক। জল, জৈবযৌগ (খাদ্যবস্তু) মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের শোষক। অতএব, মাইক্রোওয়েভ স্বচ্ছ পাত্রে, মাইক্রোওয়েভ শোষক রেখে এই তরঙ্গ প্রবাহিত করলে শোষক (খাদ্য) গরম হবে কিন্তু পাত্র হবে না। ধাতব পাত্র ব্যবহার করা কিন্তু বিপজ্জনক। আমাদের শরীর জল, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের যৌগ। আমাদের শরীরও তাই মাইক্রোওয়েভ শোষণ করতে সক্ষম। অতএব, বিপদের সম্ভাবনাও আছে। সেই কারণেই মাইক্রোওয়েভ আভেনের বিবিধ সুরক্ষা ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করা বিপজ্জনক।

fork
ok, and set my lunch for two minutes.
while I wait, might as well take a dump.
should be done by no-
EXPLOSION
FFFFFFF
FFFFFFF
FFFFFF
FFFUU
UUUU
UUUU
UUUU
UUUU
UUUU-
Ragetoons.com

বর্তমানে বাজারে যে সমস্ত আভেন পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচাইতে শক্তিদক্ষ আর নিরাপদ ইন্‌ডাকশন আভেন। এতে তড়িৎ আবেশকে কাজে লাগিয়ে তাপ সৃষ্টি করা হয়।

এ জাতীয় আভেনের দুটি অংশ। ধাতব তারের একটি কুণ্ডলী আভেনের মধ্যে থাকে। সেই কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎ প্রবাহিত করা হয়। এই অবস্থায় আভেনের ওপরে চৌম্বকধর্ম বিশিষ্ট ধাতুর পাত্র রাখলে তাতে তড়িৎ আবেশ সৃষ্টি হয় এবং পাত্রটি গরম হয়ে ওঠে। এই আভেনে রান্নার পাত্রটি নিজেই তাপ সৃষ্টি করে গরম হয়। বাইরে থেকে তাপের সঞ্চালনের প্রয়োজন থাকে না। শক্তির অপচয় এখানে তাই খুবই কম।

এখানে একটিই শর্ত। রান্নার পাত্রটিকে হতে হবে চৌম্বকধর্ম বিশিষ্ট। অ্যালুমিনিয়াম, তামা, কাচ অথবা পলিমার চলবে না। চলবে লোহা বা ওই জাতীয় চৌম্বকধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ।

এখনো পর্যন্ত তড়িৎশক্তি চালিত আভেনগুলোর মধ্যে ইন্‌ডাকশন আভেন সর্বোৎকৃষ্ট।

তাপশোষক যন্ত্র: তাপশোষক যন্ত্র বলতে আমরা বুঝি এয়ারকন্ডিশনার আর রেফ্রিজারেটার। প্রথমটি বড়সড় জায়গাকে ঠাণ্ডা করে, দ্বিতীয়টি ছোট আলমারি জাতীয় জায়গাকে ঠাণ্ডা করে। ঠাণ্ডা করার পদ্ধতি ও নীতি কিন্তু একই।

তরল বাষ্পীভূত হবার জন্য তাপ শোষণ করে। হাতে এক ফোঁটা স্পিরিট ঢাললেই আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি। বাষ্পকে চাপ দিয়ে তরলে পরিণত করলে বাষ্প তার অর্জন করা তাপ বর্জন করে। ফ্রিজের ভেতরে তরল বাষ্পীভূত হয়ে ভেতরটা ঠাণ্ডা করে। ফ্রিজের বাইরে সেই বাষ্প তরলে পরিবর্তিত হওয়ার সময় তাপ বর্জন করে। এর ফলে ফ্রিজের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয় আর বাইরেটা গরম হয়। অনেকটা যেন ফ্রিজের ভেতরের তাপ পাম্প করে বাইরে ফেলা হচ্ছে। ফ্রিজকে দেয়াল থেকে একটু দূরে রাখতে বলার কারণ বর্জিত তাপ যাতে সহজে এবং দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে।

যে যন্ত্র দিয়ে বাষ্পের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়, তার

নাম কম্প্রেসার। এই কম্প্রেসার চলে তড়িৎশক্তিতে। বাষ্পকে তরলে পরিণত করতে যতটা শক্তির প্রয়োজন, কম্প্রেসার কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি শক্তি খরচ করে। এই বাড়তি শক্তি খরচ অপচয়। সঙ্গত কারণেই গত শতাব্দীর বিশের দশকে কম্প্রেসার ছাড়া ফ্রিজ বানাবার বেশ কিছু প্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া যায়, যাতে খোদ আইনস্টাইনও অংশ নিয়েছিলেন। এইসব ফ্রিজ বিদ্যুৎ ছাড়াই চলত।

এখানেই শেষ নয়। বর্তমান বিশ্বে আরেক ধরনের ফ্রিজ পাওয়া যায়, যেগুলো সম্পূর্ণ অন্য নীতিতে চলে। দুটি বিষম ধাতুর তারের এক প্রান্ত জুড়ে দিয়ে তার ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করলে বিদ্যুতের অভিমুখ অনুসারে, জোড়া প্রান্তটিতে হয় তাপের উদ্ভব হবে অথবা সেই প্রান্ত থেকে তাপ শোষিত হবে। আবিষ্কারকের নাম অনুসারে একে পেল্টিয়ার প্রতিক্রিয়া বলে (পেল্টিয়ার এফেক্ট)। এই নীতি কাজে লাগিয়েও ফ্রিজ বানানো হয়। এর শীতলীকরণের দক্ষতা কম এবং এর ওজন কম। এটা ব্যাটারিতে চলে। শক্তি-দক্ষতা অবশ্য এর মোটেই বেশি নয়।

শক্তির অপচয় সত্ত্বেও মানুষের শীতলতা সৃষ্টির প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মানুষ শীতলতা এতটাই পছন্দ করে যে খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ সালেই সে শীতল প্রকোষ্ঠ তৈরি করেছিল (সিরিয়ায়)। প্রথম পারিবারিক ফ্রিজ তৈরি হয় ১৮০৩ সালে। আইনস্টাইন জিলার্ডের সঙ্গে যৌথভাবে ফ্রিজের পেটেন্ট স্বত্ব নেন। ১৯২৬-এ যেটা তাঁরা 'ইলেকট্রোলাক্স' কোম্পানিকে ব্যবহার করার অনুমতি দেন। শীতলতার জন্য মানুষের আগ্রহ খুব বেশি, কারণ মানুষ সহ সমগ্র প্রাণী জগৎ শীতল পরিবারের বাসিন্দা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শীতলতম উষ্ণতা -২৭৩° কেলভিন, এর তলায় উষ্ণতা সম্ভব নয় (তাপগতি বিদ্যার সূত্র)। অথচ উচ্চতম উষ্ণতার কোনো সীমা নেই। সূর্যের অভ্যন্তরের উষ্ণতা এক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও বেশি। এইজন্যই আমরা ভালবাসি ঠাণ্ডা। তবে ঠাণ্ডা করার যন্ত্র ও ফ্রিজ ব্যবহারে প্রয়োজন বিদ্যুৎশক্তির এবং হাইড্রোকার্বন গ্যাসের, যা পরিবেশ-অনুকূল নয়।

অন্ধকার দূর করার যন্ত্র: মানুষ সহ প্রাণীদের একটা বিশাল অংশ দিনের আলোয় খুব স্বচ্ছন্দ। সমস্ত কাজ সূর্যের আলোয়। সূর্য ডুবলেই, প্রাক্ সভ্যতা যুগে, সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ। মানুষের প্রয়োজন আরেকটু বেশি কাজের সময়। কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থার প্রয়োজন সে কারণেই।

শুধু কি মানুষ! বাবুই পাখির বাসায় জোনাকি পোকা আলো জোগায়। জোনাকি পোকার ঠাণ্ডা-মিষ্টি আলো। লুসিফারিন-লুসিফারেজ এনজাইম ঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে শক্তি নির্গত হয়, তা হয় সম্পূর্ণ আলোক শক্তির রূপ ধরে। এর ফলে শুধু আলোই পাওয়া যায়, ফাউ হিসেবে তাপ উৎপন্ন হয় না।

কিন্তু আমাদের যে আলো, তাতে আলোর সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা উত্তাপেরও সৃষ্টি হয়। ফলে লোকসান দু রকমের। উত্তাপ ঘরকে উষ্ণ করে। সেই উষ্ণ ঘরকে ঠাণ্ডা করতে এয়ারকণ্ডিশনার— ফের খানিকটা শক্তি খরচ। আর, আলোর সঙ্গে তাপের উদ্ভবের জন্য শক্তির অপচয় তো আছেই।

আলোর উৎপাদনে কতটা শক্তির অপচয় হয়? হিসেব মতো এক ওয়াট তড়িৎশক্তি থেকে ৬৮০ লুমেন আলো পাবার কথা। আমরা পাই সর্বোচ্চ ৭০ লুমেন। তড়িৎশক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরের দক্ষতা বাড়াবার জন্য বিশ্বজুড়ে গবেষণা চলছে। হয়ে চলেছে উদ্ভাবন যা দেখানো হয়েছে সারণী-১ এ।

সারণী ১

আলোর উদ্ভাবনের বিবর্তন

আবির্ভাব কাল	জ্বালানি	উদ্ভাবন/উদ্ভাবক
প্রাগৈতিহাসিক	প্রাণীজ চর্বি	ছিদ্রযুক্ত পাথরে ভিজিয়ে জ্বালানো
খ্রিঃ পূর্ব ৪৫০০	তেল	তেলের বাতি
” ৩০০০	মোম	মোমবাতি
” ৯০০	খনিজ তেল	মহম্মদ ইবন
খ্রিস্টাব্দ ১৭৯২	গ্যাস	উইলিয়াম মারডক
” ১৮৬৭	তড়িৎ শক্তি	ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প/বেকারেল
” ১৮৭৫	”	ইলেকট্রিক বাল্ব
” ১৮৮০	”	১৬ ওয়াট বাল্ব/ এডিসন
” ১৯০১	”	মার্কারিভেপার ল্যাম্প/ পিটার কুপার
” ১৯১০	”	নিয়ন লাইট/ জর্জেস ক্রাউড
” ১৯৬২	”	এল ই ডি/ হোলোনিয়াক
” ১৯৮১	”	কমপ্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প
” ১৯৯৫	”	সাদা এল ই ডি

এইভাবেই আমরা সাধারণ ফিলামেন্ট যুক্ত ল্যাম্প থেকে টিউবলাইট, কমপ্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প বা সি এফ এল

পেরিয়ে এল ই ডি ল্যাম্পে এসে পৌঁছেছি। এল ই ডি হল একটি ডায়োড, যা বিশেষ ব্যবস্থায় আলো উৎপন্ন করে— লাইট এমিটিং ডায়োড। শক্তি সাশ্রয়ের নিরিখে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে?

সারণী — ২

বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ল্যাম্পের বৈশিষ্ট্য

নাম	ওয়াটপিছু লুমেন	আয়ু (ঘণ্টা)
সাধারণ বাল্ব	১০-১৭	৭৫০-২৫০০
ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প		
(ক) সোজা লম্বা (টিউব)	৩০-১১০	৭০০০-২৪০০০
(খ) সি এফ এল	৫০- ৭০	৬০০০-১৫০০০
এল ই ডি	২৭-৯২	২৫০০০-৫০০০০

সে সমস্ত বাতি তুলনামূলকভাবে কম তাপ উৎপন্ন করবে শক্তি দক্ষতা তারই বেশি হবে। এলইডি এই নিরিখে সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহলেও এর দক্ষতা যথেষ্ট কম। অতএব গবেষণার সুযোগ এখানে অতি মাত্রায় উপস্থিত এবং বর্তমান গবেষণার গতিপ্রকৃতি দেখে এমনটা ধারণা করা যেতেই পারে যে অদূর ভবিষ্যতে জোনাকির মতো ঠাণ্ডা আলো আমাদের ঘরেও জ্বলবে তাতে বাবুই পাখির যতই হিংসে হোক না কেন।

যোগাযোগ স্থাপনের যন্ত্র: যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে এখন প্রথমেই মনে পড়ে হাতের তালুতে রাখা একটি যন্ত্রের নাম— মোবাইল ফোন বা সেলফোন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা অর্জনের এমন রেকর্ড অন্য কোনো যন্ত্রের ভাগ্যে জুটেছে কিনা সন্দেহ। মোবাইল বা সেলফোন এখন শুধু কথা বলার যন্ত্র নয়, এ যেন একটা ছোটখাটো কম্পিউটার। গান শোনা বা সিনেমা দেখা এবং আরো কত কি! অনেক শান্তিপ্রিয় অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মানুষের কাছে এটা যন্ত্র নয়, যন্ত্রণা। আবার আধুনিক ব্যস্ত মানুষের কাছে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অফিস-ব্যবসা পরিচালনা থেকে বাজারহাট এমনকি ব্যাঙ্কের পরিষেবা নেওয়া, সবই সম্ভব এই যন্ত্রের দাক্ষিণ্যে।

এ হেন যোগাযোগ ব্যবস্থা, যা জীবনযাত্রার মান এবং অভিমুখের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছে, তার উদ্ভাবন ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদের দুটি বৈচিত্র্যপূর্ণ আবিষ্কারের মাধ্যমে। কিন্তু তারও আগে যা ঘটেছিল তাও কম চমকপ্রদ নয়!

১৭৯২ সালে ক্লাউড্ স্যাপি (Claude Chappe) বেশি দূরত্বের ব্যবধানে এক ধরনের টেলিগ্রাফ যোগাযোগের চেষ্টা করেন। ১৮৩১-এ জোসেফ হেনরি তড়িৎ-টেলিগ্রাফ যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন। যুগান্তকারী কাজটি করলেন স্যামুয়েল মোর্স। ১৮৩৫ সালে উদ্ভাবন করলেন মোর্স-কোড্। বার্তা সংবহনের জন্য সাঙ্কেতিক ভাষা এবং ১৮৪৩-এ স্থাপন করলেন তড়িৎ-টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা। বিপ্লব ঘটালেন গ্রাহাম বেল। ১৮৭৬-এ বেল এবং ওয়াটসন, বস্টনে টেলিফোন যন্ত্র প্রদর্শন করলেন। গবেষণা তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। ১৮৮৯ সালে আলমন স্ট্রওগার সরাসরি ফোন করার যন্ত্রের মেধাস্বত্ব নিলেন। এই হল এযাবৎ প্রচলিত টেলিফোনের উদ্ভাবনের ইতিহাস। ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এর ব্যবহার চলে আসছে।

প্রায় একই সময় আরেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার বিশ্বে সাড়া ফেলেছিল। ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসের এক স্মরণীয় কাল। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গকে ব্যবহার করে, কলকাতারই এক পরীক্ষাগারে, সর্বপ্রথম দূর বেতার নিয়ন্ত্রণের সফল পরীক্ষা করে দেখালেন স্যর জগদীশচন্দ্র বসু। ১৯০১ সালে মার্কনি সেই এক জাতীয় পরীক্ষা করলেন এবং মেধাস্বত্ব গ্রহণ করলেন। বেতার সম্প্রচার চালু হবার এটাই পশ্চাৎপট। এখানেও যোগাযোগ ব্যবস্থা বা বার্তা বিনিময়ের প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেই বর্তমানের মোবাইল ফোন তার কাজ করে।

টেলিফোনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রযুক্তি সকলের ব্যবহারের জন্য এগোতে থাকলেও, মূল কার্যনীতি আবিষ্কারের অনেক বছর পরে বেতার যোগাযোগ পদ্ধতি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য মোবাইল ফোন আকারে জন্ম নিল। মূল নীতি আবিষ্কারের পর দীর্ঘদিনের অপেক্ষার কারণ বেতার যোগাযোগের যন্ত্রটির আকার, আয়তন এবং ওজন। ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ তখন তৈরি হত কাচের গোলোকের মধ্যে (ভ্যাকুয়াম টিউব)। যেমন তার আয়তন, তেমনি তার ওজন। যাঁদের বাড়িতে এখনো পুরনো (ভ্যাল্ব সেট) রেডিও আছে, তাঁরা তুলনা করতে পারেন এখনকার মোবাইল ফোনের রেডিওর সঙ্গে।

এই অসুবিধাটা হঠাৎ দূর হয়ে গেল জন বারডিন, উইলিয়াম সোক্লে এবং ওয়াল্টার ব্রাটাইনদের একত্র আবিষ্কার— ১৯৪৭ সালে। তাঁরা দেখালেন তড়িৎ পরিবাহী এবং অপরিবাহীর মাঝখানে আরেক ধরনের পদার্থ আছে। তাদের বলে অর্ধ পরিবাহী। এই ধারণা থেকে জন্ম নিল

বৈপ্লবিক শব্দ ট্রানজিস্টার। ট্রান্সফার এবং রেজিস্টর এই শব্দদুটো জুড়ে হল ট্রানজিস্টার। ক্যাচের বড়বড় ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রাংশ ক্ষুদ্রাকার হয়ে গেল। এই কাজটি হয়েছিল আমেরিকার বেল পরীক্ষাগারে। ইলেক্‌ট্রনিকস্‌ বাঁক নিল বিপ্লবের পথে। প্রাপ্ত হল কঠিন দশা। ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রের ওজন এবং আয়তন কমতে আরম্ভ করল। ১৯৪৪-এর আই বি এম নির্মিত ৫ টনের কম্পিউটার আজ হয়ে গেছে ট্যাবলেট।

মাত্র সেদিনের কথা। ১৯৭৩-এর ৩ এপ্রিল। নিউ ইয়র্ক শহরের সিক্সথ অ্যাভেনিউ ধরে হাঁটতে হাঁটতে মোটোরোলা কোম্পানির বিজ্ঞানী মার্টিন কুপার ফোন করলেন তাঁরই প্রতিদ্বন্দ্বী বেল গবেষণাগারের প্রধান জোয়েল অ্যাঞ্জেলকে। ফোনের ওজন ১.১ কিলোগ্রাম। লম্বায় ১০ ইঞ্চি। ফোনের কথোপকথন স্থায়ী হয়েছিল ২০ মিনিট। ব্যাটারির চার্জ শেষ। এটাকেই ধরা হয় সত্যিকারের মোবাইল কথোপকথন। তার আগে অনেক নিম্নমানের বা অনুন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেনাবাহিনী মোবাইল টেলিফোনে তথ্য আদান-প্রদান করত। রসিকজনেরা বলেন, তখন মোবাইল ফোনটি যে গাড়িতে থাকত সেগুলো ছিল ছোটখাটো সব টেলিফোন কেন্দ্র।

সাধারণ টেলিফোন বা ল্যান্ড ফোন পরস্পরের সঙ্গে ধাতব তার দিয়ে যুক্ত থাকে। তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ শক্তির রূপ ধরে বার্তা বাহিত হয়। এ এক বিশাল ব্যবস্থা। প্রচুর ধাতব তার, ওজনদার সব যন্ত্রপাতি। এইসবকে বাতিল করে দিয়ে মোবাইল ফোন তার জায়গা দখল করল। ফলে অবশ্যই সাশ্রয় হল বিপুল জ্বালানির।

> প্রতিটি সেল ফোনের সঙ্গে উৎপাদক সেই ফোনের এস এ আর (স্পেসিফিক অ্যাবসরপ্‌শন রেট) মানটিও সরবরাহ করে এবং অনেক সতর্ক বার্তারও উল্লেখ করে। প্রায় পড়ার অযোগ্য ছোট ছোট হরফে ছাপা সেইসব সতর্কবাণী অসতর্কভাবে গ্রাহকেরা উপেক্ষা করে থাকেন।

মোবাইল ফোনে বার্তা বাহিত হয় তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের এক নির্দিষ্ট পরিসরে। এই পরিসরটি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মাইক্রোওয়েভ পরিসরের একটি অংশ। মাইক্রোওয়েভ পরিসরে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের অনেক ব্যবহার যার একটি বড় অংশ প্রতিরক্ষার কাজে। মোবাইল ফোনের জন্য ৮০০ থেকে ৩০০০ মেগা হার্ৎজ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত পরিসর নির্দিষ্ট আছে।

যদি শক্তি সংরক্ষণের সাপেক্ষে দেখা যায়, শুধুমাত্র যন্ত্র তৈরির সামগ্রী এবং যোগাযোগ স্থাপনকারী তার ইত্যাদির উৎপাদনে যে শক্তি খরচ হয়, তা বিপুলভাবে কমে যায় বর্তমান প্রযুক্তিতে। অতএব, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় বর্তমান প্রযুক্তি শক্তি-সঞ্চয় বান্ধব। একটি মোবাইল ফোন একাধারে বেতার সম্প্রচার এবং বেতার গ্রাহক যন্ত্র।

মোবাইল ফোন একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এর কিন্তু কতগুলো বিপজ্জনক দিকও আছে। মোবাইল ফোন মারফত যে শক্তির আদান-প্রদান হয়, তার কিছুটা আমাদের শরীর শোষণ করে। এই শক্তির ধরনের শারীরিক প্রভাব সম্ভব— তাপীয় ও অতাপীয়। তাপীয় প্রভাবে শরীরের যে অঞ্চল শক্তি শোষণ করবে সেই অঞ্চল উত্তপ্ত হবে (যেমন মাইক্রোওয়েভ আভেনে হয়)। কিন্তু মোবাইল ফোন থেকে নির্গত শক্তি এতটাই কম মাত্রার যে এই তাপীয় প্রভাবের তেমন কোনো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

মোবাইল ফোনের অতাপীয় প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিন্তু বিস্তর গবেষণা চলছে। যদিও সর্বসম্মত কোনো ফলাফল এখনো পাওয়া যায় নি, কিন্তু এ জাতীয় প্রতিক্রিয়া যে মস্তিষ্কের কোষগুলোর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এইজন্যই প্রতিটি সেল ফোনের সঙ্গে উৎপাদক সেই ফোনের এস এ আর (স্পেসিফিক অ্যাবসরপ্‌শন রেট) মানটিও সরবরাহ করে এবং অনেক সতর্ক বার্তারও উল্লেখ করে। **প্রায় পড়ার অযোগ্য ছোট ছোট হরফে** ছাপা সেইসব সতর্কবাণী অসতর্কভাবে গ্রাহকেরা উপেক্ষা করে থাকেন।

মোবাইল ফোন অবশ্যই শিশুদের খেলার সঙ্গী হতে পারে না। যতদূর সম্ভব একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে এই ফোন ব্যবহার করা উচিত নয়।

অতি প্রয়োজনীয় সভ্যতাবান্ধব এই যন্ত্রটি যেন পরবর্তী জীবনে অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায়।

উমা

রামায়ণের অযোধ্যা: ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইউটোপিয়া

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

রামরাজ্য-র কথা সবাই জানেন। 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পটির গোড়ায় পরশুরাম তার বর্ণনা দিয়েছেন। চোদ্দো বছর বনবাস আর সীতা-উদ্ধারের পর রাম ফিরে এলেন স্বদেশে, ভরতের হাত থেকে তুলে নিলেন রাজ্যভার। তারপর

> রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কোশলরাজ্য শান্তির ও স্বাস্থ্যের নিলয় হইল, প্রজার গৃহ ধনধান্যে ভরিয়া উঠিল, তস্কর, বঞ্চক ও পণ্ডিতমূর্খগণ বৃত্তিনাশহেতু পলায়ন করিল। দেশে আর্ত পীড়িত নাই, ধর্মাধিকরণে বাদী প্রতিবাদী নাই, কারাগার জনশূন্য। ভিষগ্‌গণ রোগীর অভাবে ভোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন, বিচারকগণ পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধানে রত হইয়া অবসরবিনোদন করিতে লাগিলেন।

কথাগুলো অবশ্যই ঠাট্টা করে লেখা; *বাল্মীকি-রামায়ণ*-এ রামরাজ্য-র বর্ণনা অন্যরকম। যুদ্ধকাণ্ড-র শেষে সেখানে বলা হয়েছে:

> রামের রাজ্যকালে কোনও স্ত্রী বিধবা হয় নি, হিংস্র জন্তু ব্যাধি ও দস্যুর ভয় ছিল না, বৃদ্ধকে অল্প বয়স্কের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে হ'ত না। সকলে আনন্দচিত্তে বহু পুত্র সহ সহস্র বৎসর জীবিত থাকত। বৃক্ষে প্রচুর পুষ্প ফল মূল উৎপন্ন হ'ত। রামরাজ্যের সকল প্রজা নিজ নিজ কর্মে তুষ্ট, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও সুলক্ষণসম্পন্ন ছিল।
> (রাজশেখর বসুর তর্জমা)

রামরাজ্য এক ধরনের সব-পেয়েছির দেশ, ইউ*টোপিয়া*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতি ইউটোপিয়া-র প্রতিশব্দ করেছিল 'রামরাজ্য'। তবে এই প্রতিশব্দটি কেউ ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হয় না। সে যা-ই হোক, যুদ্ধকাণ্ড-য় রামরাজ্যর বর্ণনা বড়ই সংক্ষিপ্ত। সে-তুলনায় বালকাণ্ড-র গোড়ায় দশরথের আমলে অযোধ্যা নগরীর একটি বিস্তৃত বিবরণ আছে। সেটিকেই বরং প্রাচীন ভারতের একটি ইউ*টোপিয়া* বলে ধরা যায়। নিচে তার পুরোটাই তুলে দিচ্ছি:

সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যাপুরীতে বেদ-বেদাঙ্গবিৎ, দূরদর্শী, বীর, বিদ্বদ্‌বৃন্দের সংগ্রহকর্ত্তা, মহাতেজস্বী, পুরবাসী ও জনপদ-বাসী জনগণের অতিশয় প্রিয়-পাত্র, ইক্ষ্বাকুগণের মধ্যে অতিরথ, দশরথ নামে যজ্ঞশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, মহর্ষি সদৃশ, ত্রিলোক-বিশ্রুত রাজর্ষি ছিলেন। তিনি বলবান, নিঃসপত্ন, মিত্রযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি ধনধান্যসঞ্চয়ে দেবরাজ ও কুবের তুল্য ছিলেন। বৈবস্বত মনু যেরূপ জগৎ পালন করিতেন, তিনিও সেইরূপ জগতের পালক ছিলেন। সেই সত্যনিষ্ঠ রাজা দশরথ, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-রূপ ত্রিবর্গসাধনের নিমিত্তই সেই অযোধ্যাপুরী দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতী পুরী পালন করেন, সেইরূপ প্রতিপালন করিতেন। সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে সমুদায় লোকই বাসসুখে প্রীত ছিল। সকলেই ধার্ম্মিক, বহুজ্ঞ, স্ব স্ব সম্পত্তিতে পরিতুষ্ট থাকিত। তাহারা লুব্ধ ছিল না এবং সত্যপরায়ণ ছিল, কোন কুটুম্বী গৃহস্থই অল্পসঞ্চয়ী ছিল না। যে গৃহস্থের গো, অশ্ব, ধনধান্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য ছিল না, যাহার ঐহিক পারত্রিক কামনা সিদ্ধ হয় নাই, সেইরূপ গৃহস্থ ঐ নগরীতে ছিল না। কামপরায়ণ, স্বজনপীড়ক, নৃশংস, মূর্খ বা নাস্তিক মানব সেই পুরীতে কদাচ দেখা যাইত না। সকল নরনারীই ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয় ছিল, এবং সকলেই মহর্ষিদিগের ন্যায় নির্ম্মলস্বভাব ছিল। সকলেই কুণ্ডল, কিরীট ও মাল্য ধারণ করিত, সকলেই মৃষ্ট ভোজ্য ভোজন করিত, পরিচ্ছন্ন থাকিত, এবং শরীরে চন্দনাদি বিলেপন করিত। অঙ্গদ, নিষ্ক ও করাভরণ সকলে ব্যবহার করিত। সকলেরই অন্তঃকরণ উচ্ছৃঙ্খলতা-বিহীন ছিল। সকলেই সাগ্নিক ও যজ্ঞদীক্ষিত ছিল, রাজ্যমধ্যে কেহ নীচ, সদাচারহীন বা বর্ণসঙ্কর ছিল না। ব্রাহ্মণগণ জিতেন্দ্রিয়, আত্মকর্ম্মরত, দানাধ্যয়নপরায়ণ ও প্রতিগ্রহবিষয়ে সংযতচিত্ত ছিলেন অর্থাৎ অসৎপ্রতিগ্রহ করিতেন না। কেহই নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, সামান্য শিক্ষিত, অসূয়াপরায়ণ ও ব্রতাদি-কার্য্যবিহীন ছিলেন না। সকলেই ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিতেন, কেহই দরিদ্র, ক্ষিপ্ত বা ব্যথিত ছিল না। নর বা নারী কেহই রূপলাবণ্য-বিহীন বা কুশ্রী ছিল না, রাজভক্তির বিরুদ্ধে কাহারও মনের ভাব লক্ষিত হয় নাই। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই দেবতা ও অতিথির

অর্চ্চনাপরায়ণ ছিলেন, অধিক কি, সকলেই কৃতজ্ঞ, উদার ও বীরাগ্রগণ্য ছিলেন। সকলেই দীর্ঘজীবী এবং ধর্ম্ম ও সত্যাবলম্বী ছিলেন, কাহাকেও অকালমৃত্যুর হস্তে পতিত হইতে হয় নাই; পুত্র, পৌত্র ও কলত্র লইয়া সকলে সুখে কালযাপন করিত। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত; এইরূপে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসেবায় নিযুক্ত থাকিত। যেরূপ প্রজাপতি বৈবস্বত মনুর হস্তে পূর্ব্বে এই রাজধানী সংরক্ষিত হইয়াছিল, ইক্ষ্বাকুনাথ দশরথও তাঁহার ন্যায় ইহার শাসন করিয়াছিলেন। সিংহ দ্বারা পর্ব্বতের গুহা যেরূপ পূর্ণ হয়, সেইরূপ এই রাজধানী অগ্নিতুল্য তেজস্বী, অসহিষ্ণু, সরলস্বভাব, ধনুর্বিদ্যাপারদর্শী বীরগণে পরিপূর্ণ ছিল। সেই পুরী, কাম্বোজ-বাহ্লীক-বনায়ু ও সিন্ধুদেশজাত উৎকৃষ্ট অশ্বে পরিপূর্ণ থাকিত; এইরূপ বিন্ধ্যপর্ব্বতজাত, হিমালয়োৎপন্ন, পর্ব্বত সদৃশ মদমত্ত মাতঙ্গে অযোধ্যা সুরক্ষিত থাকিত। ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন ও বামনবংশপ্রসূত ভদ্রমন্দ, ভদ্রমৃগ ও মৃগভদ্র নামক সঙ্কর হস্তীতে ঐ পুরী সমাচ্ছন্ন থাকিত। সকল মাতঙ্গ মদোন্মত্ত এবং পর্ব্বত সদৃশ; কেহ এখানে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছিল। যদিও বিস্তারে উহা তিন যোজন মাত্র, কিন্তু দুই যোজনের মধ্যে কেহ যুদ্ধ করিতে সাহসী হইত না। তারাপতি যেরূপ তারকাদিগকে শাসন করেন, তাহার ন্যায় শত্রুবিমর্দ্দন ইন্দ্রতুল্য নৃপতি দশরথ সুদৃঢ় তোরণবিশিষ্ট অর্গলযুক্ত দিব্যগৃহশোভিত লোকাকীর্ণ মঙ্গলালয় অযোধ্যাপুরী শাসন করিতেন। ১।৬।১-২৯।

এ হলো *রামায়ণ*-এর একটি প্রচলিত পাঠ-এর অনুবাদ।[১] তারপরে *রামায়ণ*-এর 'চিকিৎসিত পাঠ' অর্থাৎ প্রামাণিক বা বিচারমূলক সংস্করণ বেরিয়েছে। তাতে দেখা যায় : প্রচলিত পাঠ-এর কিছু শ্লোক বা তার অংশবিশেষ পরবর্তী সংযোজন বলে বাদ গেছে।[২] যে-পাঠই পড়া হোক, এই আদর্শ নগরীর বর্ণনায় বিশেষ তফাত হবে না।

অযোধ্যার বিশেষত্ব কী? সকলেই শুধু বড়লোক নন, স্বভাবচরিত্রও ভালো। আর সেই সঙ্গে সকলেই ধর্মভীরু, সকলেই যজ্ঞ করেন, আর চার বর্ণর প্রথা অটুট রয়েছে। পিরামিডের মতো সাজানো এই সমাজ। তার একেবারে চূড়ায় রয়েছে ব্রাহ্মণ, তার সেবা করে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়র সেবা করে বৈশ্য, আর ঐ তিন বর্ণর সেবা করে শূদ্র। কিন্তু তার জন্যে কারুর কোনো অপ্রীতির ভাব ছিল না, কেউ লোভী ছিলেন না, যে যাঁর নিজের সম্পদে খুশি থাকতেন। অর্থাৎ, এই দশরথ-রাজ্য সব মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি : অধিকারভেদ ও বর্ণভেদ পুরোদস্তুর বহাল। যে-গৃহস্থদের গুণ ও সম্পদের বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরা সবাই দ্বিজাতির বা প্রথম তিন বর্ণর লোক। শূদ্ররা কী করতেন, কী খেতেন, কী করে বাঁচতেন — সে-কথা *রামায়ণ*-এ নেই।

অন্য একটি ব্যাপারও নজর করার মতো। অযোধ্যা-বর্ণনায় বলা হয়েছে — একবার নয়, দুবার — যে এই শহরে কেউ নাস্তিক ছিল না। 'নাস্তিক' বলতে কী বোঝায় সে-ব্যাপারে অবশ্য মতভেদ আছে। মধ্যযুগের টীকাকাররা এর নানারকম মানে করেছেন: পরলোকে অবিশ্বাসী, বেদ-এর অভ্রান্ততায় আস্থাহীন, নিরীশ্বরবাদী ইত্যাদি। হালের একটি ইংরিজি অনুবাদে নাস্তিক-এর জায়গায় লেখা হয়েছে: *অ্যাগনস্টিক*, অজ্ঞেয়বাদী[৩]। তার মানে, ভগবান আছেন না নেই, ভগবানই জগতের সৃষ্টিকর্তা কি না, স্বর্গ নরক আছে না নেই— এইসব প্রশ্নর সামনে পড়লে যিনি বলেন : 'আমি জানি না।' হয়তো আরও এক পা এগিয়ে তিনি বলবেন: এসব প্রশ্নর উত্তর জানা যায় না।

ভারতের ইতিহাসে ভগবানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দু ধরণের লোকেরই হদিশ মেলে। এমনকি সংশয়ী, পরকাল পরলোক আছে না নেই — এ বিষয়ে যিনি মনঃস্থির করে উঠতে পারেন নি এমন লোকও নিশ্চয়ই ছিলেন।[৪] কিন্তু অজ্ঞেয়বাদ একেবারেই পশ্চিমী ব্যাপার। এই মতবাদ ইওরোপে দেখা দিয়েছে গত দু শতকে। কিন্তু ভারতে এমন পাশকাটানো মত কোনোদিন কি চালু ছিল? মনে হয় না। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, আর সংশয়ী— এই তিনের বাইরে চতুর্থ কোনো মত আদৌ এদেশে ছিল কি না সেটি প্রমাণসাপেক্ষ।

অযোধ্যার বর্ণনা পড়ে কেউ কেউ হয়তো মনে করবেন: এ তো ব্রাহ্মণ্য ইউ*টোপিআ*। তেমন ভাবা ঠিক হবে না। অযোধ্যার বর্ণনার শেষদিকে হাতি, ঘোড়া ও যোদ্ধাদের সম্পর্কে যে কথাগুলো আছে সেগুলোও খেয়াল করার মতো। শুধু ব্রাহ্মণদের বড় করে দেখানোই এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। বরং ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় মিলিয়ে দুটি বর্ণর স্বার্থগত ঐক্য ও প্রাধান্যই ঐ বর্ণনা থেকে বেরিয়ে আসে। মনু ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকারও একইভাবে এক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইউ*টোপিআ*-র ছবি হাজির করেছিলেন। শুধুই 'ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র' বললে শাসকশ্রেণীর চেহারাটি আড়াল করা হয়। ক্ষত্রিয়দের পৃষ্ঠপোষণ ছাড়া ব্রাহ্মণদের অত ক্ষমতা কোনোদিন হতে পারত না। ইতিহাসের বিচারেও দেখা যায়: রাজশক্তিকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বর্ণর প্রাধান্য কোথাও বজায় থাকে নি। উপনিষদের গল্পগুলোর ভেতরেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়র

বিরোধ-ও-ঐক্যর আসল রূপ ধরা পড়ে।[৫] *রামায়ণ*-এর অযোধ্যা সেই মিলিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়শক্তির প্রতিফলন।

সংযোজন

কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এ (দেব সাহিত্য কুটীর সংস্করণ) লঙ্কাকাণ্ডর শেষে রামরাজ্যর একটি বর্ণনা আছে। সেখানে বাঁদররাও বাঙালি বাবুর মতো ধুতি পরতেন :

লতা-পাতা খেত কপি পরিত কাছটি।
শ্রীরামের প্রসাদে কোঁচার পরিপাটী।।

তারপর শুরু হয় সত্যিকারের বর্ণনা :

করেন অযুত বর্ষ লোকের পালন।
জ্যেষ্ঠ-সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ।।
রামরাজ্যে কেহ কারে নাহি করে হিংসা।
যত রাজগণ করে রামের প্রশংসা।।
রামরাজ্যে শোক নাহি জানে কোন জনা।
'রামরাজ্য' বলি লোকে হইল ঘোষণা।।
(পৃ. ৪৯৬)

ব্যস, আর কিছু নেই। তবে বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষার ব্যাপারটি এই বর্ণনায় ঠাঁই পায় নি। এইটুকুই দ্যাখার।

টীকা

১. *বাল্মীকি-রামায়ণ*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির সং., বালকাণ্ড, সর্গ ৬। *রামায়ণ*-এর আরও কয়েকটি বাঙলা অনুবাদ হয়েছে। সেগুলিতেও একই জায়গায় অযোধ্যার কথা পাওয়া যাবে।

২. ভারতের সব অঞ্চলে শারদা, নাগরী, বাঙলা, তামিল ইত্যাদি লিপিতে মূল *রামায়ণ*-এর অজস্র পুঁথি পাওয়া যায়। কোনো দুটি পুঁথির পাঠ এক নয়। তার জন্যে সবচেয়ে পুরনো ও নির্ভরযোগ্য পুঁথি বাছাই করে তার একটি বিচারমূলক সংস্করণ বেরিয়েছে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, বরোদা থেকে (১৯৬০-৭৫)। ইন্টারনেট-এ সেটি পাওয়া যায়।

৩. গোল্ডম্যান-এর অনুবাদ, পৃ. ১৩৬-৩৭। *অ্যাগনস্টিসিজ্‌ম্‌* শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন টমাস হেনরি হাক্‌স্‌লি (১৮২৫-৯৫)। সংক্ষেপে তার মূল বক্তব্য জানার জন্যে রোজেনথাল ও ইউদিন, পৃ. ১২-১৩ দ্র। এ প্রসঙ্গে জে.বি.এস হলডেন-এর 'অজ্ঞাবাদের ঊর্ধ্বে' প্রবন্ধটি অবশ্যপাঠ্য।

৪. সুকুমারী ভট্টাচার্য (২০০০) দ্র। তাঁর ইংরিজি বইটিতেও (১৯৮৭) বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

৫. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৫), ১৯৪-৯৫ দ্র। ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছে ব্রাহ্মণ ঋষিরাই গুরু — উপনিষদে এমন গল্প আছে (যেমন, জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য-র গল্প)। আবার রাজা জানশ্রুতি ও রৈক্ক-র গল্পটিও বেশ মজার। এ বিষয়ে মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৪) দ্র। মনে হয় জীবিকার নিরাপত্তার জন্যে রাজার পৃষ্ঠপোষণ মেনে নিতে হতো বলেই গল্প রচনা করে ক্ষত্রিয়র ওপর ব্রাহ্মণের মহিমা প্রচার করা হয়েছিল। একবার নয়, দুবার নয়, ত্রিসপ্ত অর্থাৎ একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন পরশুরাম — *মহাভারত*-এর এই গল্পটি তারই এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। মনোবিদ্যার পরিভাষা ব্যবহার করে বিষ্ণু সীতারাম সুকঠণকর একে বলেছিলেন: অতিপূরণ *(ওভার-কম্‌পেন্‌সেশন)*। সুকঠণকর (১৯৪৪), পৃ. ৩৩০ টী. ১ দ্র।

রচনাপঞ্জি

বাল্মীকি-রামায়ণ। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনু.। বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৯৯৭ (প্রথম প্রকাশ ১৮৯০)।

রাজশেখর বসু। *বাল্মীকি-রামায়ণ*। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স, ১৩৭০ (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬)।

মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, মুখবন্ধ, রাসবিহারী দত্ত, *উপনিষদে বিপরীতের দ্বন্দ্ব*। ক্যালকাটা স্কুল অব ফিলজফিক্যাল রিসার্চ, ১৯৯৪।

সুকুমারী ভট্টাচার্য। *বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০।

হলডেন, জে. বি. এস. 'অজ্ঞাবাদের ঊর্ধ্বে'। সুতপা ভট্টাচার্য অনু.। *মানবমন*, বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ২, ৪৮-৫৩ (পুনর্মুদ্রণ)।

Bhattacharji. Sukumari. *Doubt, Belief and Knowledge*. New Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1987.

Chattopadhyaya, Debiprasad. *Knowledge and Intervention*. Firma KLM, 1985.

Goldman, Robert P. (trans.). *The Ramayana of Valmiki.* Vol.1. Delhi: Oxford University Press, 1984.

Rosenthal, M. and P. Yudin. *A Dictionary of Philosophy.* Moscow: Progress Publishers, 1967.

Sukthankar, V.S. *Critical Studies in the Mahabharata*. Bombay: Karnatak Publishing House, 1944.

Valmiki Ramayana, The. Critically edited by G. H. Bhatt and others, Baroda: Oriental Institute, 1960-75.

উমা

সাদা দুধে কালো ছায়া

গৌতম মিস্ত্রি

মানুষের মতোই গরু-মোষের স্তনে দুধ তৈরি হয় তাদের সন্তানের জন্য। যতই তিনি মহাত্মা হোন না কেন, ছাগমাতার শরীরে দুধ তাঁর জন্য তৈরি হয় না, হয় ছাগশিশুর জন্য। গরু-মোষের সেই দুধ খেয়ে কি আমরা তাদের সন্তানদের বঞ্চিত করছি না ? কাজটা কি অমানবিক নয় ? সঙ্গত এই প্রশ্নটা উঠতেই পারে। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে আমরা সে তর্ক এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু তাতেও তর্ক থামে না। যে বিজ্ঞানীরা একসময় দুধকে কমপ্লিট ফুড বলতেও দ্বিধা করেননি, তাঁরাই বলছেন, দুধ খাবেন না, ওটা বিষ। যে ডাক্তারি বইতে দুধের উপকারিতা নিয়ে আলাদা চ্যাপ্টারই লেখা হত, এখন লেখা হচ্ছে অপকারিতা নিয়ে। দুধ বিষ এই কারণেই যে, গরু-মোষ ওই দুধ তৈরি করে তাদের সন্তানের জন্য, মানুষের জন্য নয়। জৈবিক কারণেই মানুষের শরীরে তা সয়ও না। জীব জগতে একটা প্রাণী অন্য প্রাণীর মাংস খায়, ভুলেও দুধ খায় না। কিন্তু আমরা যে সেই প্রাচীনকাল থেকে দুগ্ধপোষ্য হয়ে আসছি ? গোরুকে মাতার আসনে বসিয়েছি! গোধন নিয়ে তো মহাভারতের কালেও যুদ্ধ হয়েছে। বিরাট রাজার গোরুডাকাতি করতে গিয়েছিল কুরু বাহিনী। আমাদের কেষ্টঠাকুরের কাহিনীর অনেকটাই জুড়ে রয়েছে গোবলয়। দেবী অন্নপূর্ণার কাছে ঈশ্বরী পাটনি সন্তান দুধে-ভাতে থাকুক এই বরই চেয়েছিল। আমাদের এই দুধ-দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করে চন্দ্রবিন্দু নামে বাংলা ব্যান্ড গান বেঁধেছে– দুধ না খেলে হবে না ভাল ছেলে...। তবে দুধ এড়ানোর উপায় কম। কারণ দুধ এখন গ্রামের বা পাড়ার গোয়ালায় আটকে নেই। এটি মস্ত শিল্প। আমেরিকার মতো দেশে অস্ত্রের পরেই সবচেয়ে বড় শিল্প দুধ। অস্ত্রের মতো দুধও ওরা অন্যদের গছিয়েই ছাড়বে। এসবের সঙ্গে কবে থেকে এবং কেন আমাদের দুগ্ধ-দুর্বলতা তা নিয়ে গবেষণা চলতে পারে। তা চলুকও। আপাতত এই নিবন্ধে লেখক জানাচ্ছেন, কেন দুধ বিষ। কেন তা পরিহার করাই উচিত।– সম্পাদক

নবজাতক শিশু জন্মের পরে অবচেতন মনে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে মাতৃদুগ্ধ পান করা শুরু করে, শেখাতে হয় না বা বকাঝকা করতে হয় না। এই শিশুটিই যখন লায়েক হল, মায়ের কোল থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল, সে আর দুধ খেতেই চায় না। দুধের গ্লাস নিয়ে তখন মা ও সন্তানের মধুর লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে যায়। প্রথম অবস্থায় দুগ্ধ পান ছিল নবজাতকের কাছে প্রাকৃতিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও অপরিহার্য, শৈশবের প্রথমভাগেই তা তার কাছে বিড়ম্বনা হয়ে দেখা দেয়। জীবজগতের আর পাঁচটা জীবের মতো অভ্যাসের আজ্ঞাবহ না হওয়া সেই শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে দুধ পান প্রক্রিয়াকে দেখলে দুধ পানের জৈবিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাবে।

‘আমার সন্তান যেন চিরকাল থাকে দুধে-ভাতে।’ বিজ্ঞানীরা বলছেন, খবরদার এমন বর চাইবেন না। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো মানবশিশু জন্মের পর নির্ধারিত কিছুদিন মাতৃদুগ্ধের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকে। ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে শিশুদের শক্ত খাবারে অভ্যস্ত হবার কথা। এরপর দুধ কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকারক। শ্বেতশুভ্র পাঁচটি বিষের যে চারটির কথা আগে বলা হয়েছে— প্যাকেটবন্দি পরিশোধিত নুন, চিনি, সাদা, সরু ও চকচকে পালিশকরা চাল এবং সাদা আটা, ময়দা ও তার থেকে ঘরে প্রস্তুত রুটি বা বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত বিস্কুট— এগুলোর ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা যেমন বিতর্কের ঊর্ধ্বে, দুধের ক্ষেত্রে তেমনটি নয়। আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনায় দুধ বলতে কেবল দুধই নয়, দুগ্ধজাত সব খাবার, যেমন ছানা, দই, টক দই, ঘোল, চিজ, ছানা থেকে তৈরি সন্দেশ, সন্দেশের বিকল্প হিসাবে কৃত্রিম মিষ্টি মেশানো ডায়াবেটিক সন্দেশ ও ছানা দিয়ে তৈরি মিষ্টির দোকানের অন্যান্য সবরকমের খাবার বা চিজ দিয়ে তৈরি পিৎজা ইত্যাদি বোঝানো হচ্ছে।

অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো মানবশিশুকেও মাতৃদুগ্ধে লালিত হতে হয় জন্মলগ্ন থেকে কিছুকাল। এক বছর বয়সে তার পুরোপুরি শক্ত খাবারে অভ্যস্ত হবার কথা। কোনো এক অস্বচ্ছ কারণে মায়ের কোল থেকে লাফিয়ে নিজের পায়ে

দাঁড়ানোর পরেও ছেলে-ছোকরা, জোয়ান-বুড়ো সবাই পান করে চলেছে অন্য মায়ের, অর্থাৎ বাছুরের মায়ের দুধ! স্বাস্থ্য বাগানোর জন্য নেশাগ্রস্ত হয়ে বাছুরের মুখের দুধ ছিনিয়ে নিয়ে চেটেপুটে পান করে চলেছে দুধ ও তা থেকে তৈরি হাজারো রকমের খাবার। ছোটবেলা থেকে মায়ের তৈরি করে দেওয়া সেই আসক্তি বৃদ্ধ বয়সেও ছাড়া যাচ্ছে না। মায়ের থেকে মেয়ে শিখছে, মেয়ে মা হয়ে তার মেয়েকে ধরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে নেশা। এমনভাবে বংশপরম্পরায় দুধপানের অভ্যাসের ঐতিহ্য বয়ে চলেছে। বৈশিষ্ট্যগত কারণে দুধপান একরকম আসক্তিতে পরিণত হয়। পরে যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারলেও নেশা ছাড়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, ঠিক যে স্বাস্থ্যবৃদ্ধির কামনা করে আমরা দুধ পান করে যাই, অর্থাৎ শক্তপোক্ত হাড়, প্রোটিন ইত্যাদি, তা আদতে দুধপান করার ফলে পাওয়া যাবে না। বরং উল্টোটা হবার সম্ভাবনা আছে। যে ধারণার বশবর্তী হয়ে মা সন্তানকে পশুর দুধ খাইয়ে যান বা বড় হয়েও যারা স্বাস্থ্যকর পানীয় বলে দুধ বা ছানা ইত্যাদি খাবার খাওয়া চালিয়ে যান সেটা হল, মূলত তিনটি খাদ্যগুণের জন্য— ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও ভিটামিন ডি। ভিটামিন ডি অবশ্য বিশুদ্ধ দুধে থাকে না, পরে মেশাতে হয় (ফর্টিফায়েড মিল্ক)। যাঁরা প্রোটিনের জন্য দুধের কথা ভাবেন, তাঁদের জেনে রাখা উচিত, দুধের প্রোটিন (কেজিন) অত্যন্ত নিম্নমানের এবং তা উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করে। দুধের ব্যবসায়ীরা সুচতুরভাবে দুধকে একটি সর্বগুণ সমৃদ্ধ সুষম পানীয় হিসেবে প্রচার করে আমাদের খাদ্য সংস্কৃতিকে ভুলপথে চালাচ্ছে। দুধের এই গুণগুলো কতটা বিজ্ঞানসম্মত আর কীই বা এর অপকারিতা সেই আলোচনায় আসা যাক।

বজ্রকঠিন হাড়ের জন্য দুধ?

ক্যালসিয়াম হাড়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাতব পদার্থ। এক গ্লাস (২৪০ মিলিলিটার) দুধে থাকে ২৯১ মিলিগ্রাম অর্থাৎ অনেক পরিমাণে ক্যালসিয়াম। এই দুইটি প্রাথমিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হাড়ের দৃঢ়তা বাড়ানোর প্রয়াসে দুধ পান করা জনপ্রিয় হয়ে গেল। হাড় পোক্ত করার জন্য দুধের চাহিদা হয়ত বেড়েই যেত এমনভাবে। বাদ সাধল খুঁতখুঁতে কিছু সন্দেহবাতিক চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক। ২০১৪ সালের ১১ জুন ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে ২০ বছর ব্যাপী এক বড় আকারের সমীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। সুইডেনের ৬১,৪৩৩ জন মহিলা (৩৯ থেকে ৭৪ বছরের) ও ৪৫,৩৩৯ জন পুরুষ (৪৫ থেকে ৭৯ বছরের) অংশগ্রহণ করেছিলেন। পূর্ব পরিকল্পিত পরীক্ষা নয়, গড়পড়তা ২০ বছর ধরে স্বেচ্ছায় এক গ্লাসের কম দুধ পান করে আসছেন এবং তিন ও তার বেশি গ্লাস করে দুধ পান করে আসছেন এমন নাগরিকদের দুটি ভাগে বিভক্ত করে তাদের হাড় ভাঙার হিসেবনিকেশ করা হল। দেখা গেল, দুধপানের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উরুসন্ধির (হিপ ও ফিমার) হাড় ভাঙার ঘটনা বেড়ে গেছে, আর এই প্রবণতা মহিলাদের মধ্যে বেশি। দুর্ভাবনার কথা এই যে, ক্ষতিটা কেবল হাড়ের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধিই নয়, বেশি পরিমাণে দুধ পানের ফলে হৃদরোগে মৃত্যুহারও বেড়ে যাচ্ছে। দুধ পানে হৃদরোগে মৃত্যু বেড়ে যাবার ঘটনার কারণ হিসেবে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ও ধমনীর প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন) সৃষ্টিকারী কিছু উপাদানের অস্তিত্ব (8-iso-PGF2a and interleukin 6) সন্দেহের তালিকায় আছে। **গবেষকদের অন্তিম সিদ্ধান্ত, দুধ হাড় ভাঙা রোধ করতে অক্ষম।**

অনুসন্ধিৎসু মনন নিয়ে, স্বাস্থ্যের ওপর দুধের প্রভাব নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। দুধ ও দুধ থেকে তৈরি খাবারের ব্যবহারের ব্যাপারে আমেরিকার স্বাস্থ্য নির্দেশিকা বেশি উদার— ১২০০ গ্রাম ক্যালসিয়াম গ্রহণের লক্ষ্যে ৩ গ্লাস দুধ পানের উপদেশ দেওয়া আছে। হার্ভার্ড স্কুল অভ পাবলিক হেল্‌থের কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, এটা এক ভুল পদক্ষেপ। মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যা (epidemiology) ও পুষ্টি বিভাগের অধিকর্তা প্রফেসর ওয়াল্টার উইলেটের মতে, আমেরিকার সরকারের স্বীকৃত নির্দেশিকা ঢালাও দুধপানের যে নিদান দিচ্ছে, সেটা এক অপ্রমাণিত ধারনার থেকে উদ্ভূত। বস্তুত দুধপানের সঙ্গে হাড় ভাঙা রোধের কোনো যোগাযোগ এখনও পর্যন্ত প্রমাণ করা যায় নি। সারা পৃথিবীতে আমেরিকাবাসীরা দুধ ও

ট্যাবলেটের মাধ্যমে সবথেকে বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করে থাকে, যদিও বিশ্বের মধ্যে হাড়ের ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব (অস্টিওপোরোসিস) তাদেরই সবচেয়ে কম। অন্যদিকে, চীনদেশীয় মানুষের ক্যালসিয়াম গ্রহণ আমেরিকাবাসীদের থেকে অর্ধেক, যা আসে নিরামিষ খাবার থেকে। প্রাণীদেহ থেকে নিষ্কাশিত বলে সঙ্গত কারণে দুধকে চীনদেশীয়রা আমিষ খাবার মনে করে। আমেরিকাবাসীদের থেকে চীন দেশীয়দের হাড়ের রোগভোগ লক্ষণীয়ভাবে কম। এখানে একটা মৌলিক প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে— দুধ অথবা ট্যাবলেটের মাধ্যমে ক্যালসিয়াম গ্রহণের ফলে হাড়ে ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব, যেটা কিনা হাড়ের ভঙ্গুরতা রোধ করে, সেটা আদৌ বাড়ে কি? যে সব দেশে দুধ ও ট্যাবলেটের মাধ্যমে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম গ্রহণের রীতি চালু আছে, সে দেশের নাগরিকদেরই হাড় বেশি ভঙ্গুর। যে গরুর দুধ পান করে আমরা হাড়ের ক্যালসিয়াম বাড়ানোর আশা করছি, সেই গরুটি কোথা থেকে ক্যালসিয়াম সংগ্রহ করে তার দুধে মেশাচ্ছে? ঘাসপাতা থেকে। গরু যে ভাণ্ডার থেকে ক্যালসিয়াম সংগ্রহ করছে সেখানে প্রচুর ম্যাগনেসিয়ামও আছে, যেটা কিনা ক্যালসিয়ামের হাড়ে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবশ্যিক। বৈজ্ঞানিকরা আরও একধাপ এগিয়ে বলছেন, গরুর দুধের ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়ামের স্বল্পতার জন্য কাজে লাগানো যায় না। হাড়ে ক্যালসিয়ামের অন্তর্ভুক্তির জন্য খাবারে ম্যাগনেসিয়ামের উপস্থিতিও দরকার। দুটোরই উপস্থিতি প্রয়োজন হাড়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য। শরীরে ক্যালসিয়াম গ্রহণের জন্য ক্যালসিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে সম অনুপাতে ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর প্রয়োজন, যা গরু পায় ঘাসপাতা থেকে। উন্নত দেশের উন্নত মানের দুধে প্রতি ১০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়ামের সঙ্গে ১০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু থাকে। দুধে যে পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম থাকে, তাতে সবচাইতে বেশি ক্যালসিয়ামের মাত্রা শতকরা ১১ শতাংশই গ্রহণ করা সম্ভব হয়। আসলে কতটা ক্যালসিয়াম গ্রহণ করছি, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, হাড়ের ক্যালসিয়াম কতটা ধরে রাখতে পারছি, অর্থাৎ কতটা ক্যালসিয়াম বর্জন রোধ করতে পারছি। সুইডেনের অনুসন্ধানে আরও জানা যাচ্ছে, দুধপান আমাদের হাড়ের স্বাস্থ্য তো রক্ষা করতে পারছেই না, বরং হৃদরোগজনিত মৃত্যু ডেকে আনছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকদের আরও সতর্কতা বার্তা এই যে, দুধ পানের ফলে হাড়ের শক্তি তো বাড়ছেই না, বরং স্থূলতা ও কিছু ক্যান্সারও বেড়ে যাচ্ছে। হৃদরোগে মৃত্যু বাড়ছে, বিশেষ করে মহিলাদের হাড়ের ভঙ্গুরতাও বেড়ে যাচ্ছে। এই সতর্কতা অবশ্য নতুন নয়, ১৯৯৭ সালের এক সমীক্ষায়ও এর ইঙ্গিত মেলে (D. Feskanich et al., 'Milk, Dietary Calcium, and Bone Fractures in Women: A 12-Year Prospective Study,' American Journal of Public Health 87 (1997): 992-97)। কতটা ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা স্বাস্থ্যকর– তা নিয়ে শেষ কথা বলার মতো তথ্য এখনও নেই। যতদিন না সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে, কাজ চালানোর মতো নির্দেশিকা এই যে, দৈনিক এক গ্লাস চর্বি নিষ্কাশিত (fat< 1) দুধ অথবা ৩০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম গ্রহণই যথেষ্ট।

ক্যালসিয়ামের উৎকৃষ্ট ভাঁড়ার:

খাদ্যতালিকা থেকে দুধ বাদ দিলেও ক্ষতি নেই। প্রচুর ক্যালসিয়াম পাওয়া যাবে নীচের খাবার থেকে।

খাবার	**মাপ**	**পরিমাণ (মিলিগ্রাম)**	**রোজ লাগে (%)**
সাদা বিন্‌স	১ কাপ (২৬২ গ্রাম)	১৯১	১৯ %
স্যামন মাছ	১/২ টিন	২৩২	২৩ %
সারডিন	৭টি ফালি	৩২১	৩২ %
ডুমুর	৭টি	১০৭	১০ %
গুড়	বড় চা-চামচের ১ চামচ	১৭২	১৭ %
কালো মটর	১/২ কাপ	১৮৫	১৮ %
আমন্ড	১/৪ কাপ	৭২	৭ %
কমলালেবু	মাঝারি আকারের ১টি	৬৫	৬ %
শালগমের শাক	কুচো করে কাটা ১ কাপ	১৯৭	২০%
তিল	বড় চা-চামচের ১ চামচ	৮৮	৯ %

দুধ হাড়ের ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব বাড়ানোর বদলে কমায় কীভাবে: জীবজগতে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় সব সময়ে দুয়ে দুয়ে চার হয় না। মানুষের বেলায়ও তাই। চুলে যেমন ডিমের কুসুম মাখলে চুলের ভেতরে ডিমের প্রোটিন ঢোকে না, দুধ বা ট্যাবলেটের মাধ্যমে ক্যালসিয়াম খেলে সেটা হাড়ে গিয়ে জমা হয় না। হাড় শক্ত করার প্রয়াসে, কেবল অনুমান নির্ভর দুধ (বিশেষ করে প্যাকেটজাত ও পাস্তুরাইজ্‌ড) পান করা কতটা ভুল সিদ্ধান্ত সেটা বোঝা গেল সুইডেনের সমীক্ষার ফল পাওয়ার পরে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সব মহিলাদের হাড় বেশি ভেঙেছে, যারা দুধ বেশি পান করেছে। দুধের প্রোটিন অম্ল (অ্যাসিডিক) জাতীয়। এই অক্ষমতাকে প্রশমনের জন্য হাড় থেকে ক্যালসিয়ামের ডাক পড়ে। ফলে যত দুধ পান করা হয়, তত বেশি করে হাড়ের ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যায়।

দুধে কতটা প্রোটিন থাকে: নিরামিষভোজীরা দুধকে প্রোটিনের মুখ্য অবলম্বন বলে মনে করেন। দুধকে কেউ কেউ

তরল মাংস বলে অভিহিত করে থাকেন। এর পেছনে সত্যি কতটা? দুধে শতকরা ৮৭ শতাংশই জল, ৪ শতাংশ প্রোটিন আর ৩.২৫ শতাংশ সম্পৃক্ত চর্বি (স্যাচুরেটেড ফ্যাট)। এই ৪ শতাংশ প্রোটিনের মধ্যে ৮০ শতাংশই কেজিন জাতীয়। কেজিন একটি নিম্নমানের আঠা জাতীয় প্রোটিন, প্লাস্টিক ও আসবাবপত্র শিল্পেও কাজে লাগে। দুধের প্রোটিন শরীরের কাছে অচেনা এক প্রোটিন, অনেকের অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। এর চেয়ে ডিমের সাদা অংশের প্রোটিন শরীরের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। প্রোটিনের জন্য সহজলভ্য, সস্তা ও সহজপাচ্য ডিমের সাদা অংশ, যাতে ১০ শতাংশ প্রোটিন পাওয়া যাবে, যেটা দুধের প্রোটিনের আড়াই গুণ। একটা ডিমের সাদা অংশে ৩.৬ গ্রাম প্রোটিন আছে। ডাল জাতীয় খাদ্যে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ (শুকনো ওজনের হিসেবে) প্রোটিন পাওয়া যাবে, যেটা নিরামিশভোজীরা প্রোটিনের বিকল্প উৎস ভাবতে পারেন। দুধের প্রোটিনের আরও কিছু সমস্যা আছে। খাবারের প্রেটিনের একটা অংশ পৌষ্টিকতন্ত্র থেকে রক্তে মেশে (বায়ো-অ্যাভেলেবলিটি)। এটা ডিমের চেয়ে দুধে বেশ কম। দুধকে জীবাণুমুক্ত করা ও অধিক সময়ে সংরক্ষণের জন্য পাস্তুরাইজেশন করা হয়। উচ্চচাপে দুধের স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি তাপমাত্রায় দুধকে গরম করার ফলে দুধের প্রোটিনের গঠনগত পরিবর্তন ঘটে। এমন প্রোটিন হজম করা শক্ত।

দুধ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহারযোগ্য ক্যালসিয়াম বা প্রোটিন কোনোটাই পাওয়া যাচ্ছে না। বরং দুধের সঙ্গে পেটে ঢুকে যাচ্ছে অবাঞ্ছিত সম্পৃক্ত মিল্ক ফ্যাট। আজকের দিনের দুধ একটি প্রক্রিয়াকৃত পানীয়। সেই প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয় গরুর খাটাল থেকে। গরুর খাদ্য এখন প্রাকৃতিক ঘাস পাতা নয়। খড়, বিচালি, ভুসির সঙ্গে অধিক দুধের লালসায় গরুর খাবারে মেশানো হয় কীটনাশক, মেশানো হয় মানুষের শাকসব্জির অখাদ্য অংশ, আমিষ খাবারের এঁটোকাঁটা, মৃত জীবজন্তুর দেহাবশেষ থেকে তৈরি প্রক্রিয়াকৃত বস্তা বস্তা পশুখাদ্য। ইদানীং চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি গরু মোষের জন্য হাইড্রোপানক সবুজ পশুখাদ্য ব্যবহার হচ্ছে। এতে কৃত্রিম উপায়ে গরুর প্রজনন ক্ষমতা বাড়ছে, গরু দুধও বেশি দিচ্ছে। দুর্ঘটনাও ঘটছে, কারণ হাইড্রোপানক পশুখাদ্যকে ছত্রাক ও অন্যান্য জীবাণুমুক্ত করার জন্য হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, ক্লোরিন ও অন্যান্য রাসায়নিক ব্যবহার করতে হচ্ছে। মাঠেঘাটে চরে ঘাস খাওয়া গরু-মোষ আর বাণিজ্যিকভাবে প্রতিপালিত গবাদি পশুর খাবার ও লালনপালন অনেকটাই আলাদা। বাণিজ্যিকভাবে প্রতিপালিত গরু বা মোষের দুধই আমাদের দেশে বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে, যাদের তুচ্ছ কারণে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি করে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। এখানেই শেষ নয়। বাছুর ভূমিষ্ঠ হবার পরে, বাছুরকে এক-আধ দিন দুধের স্বাদ দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সদ্য মা-হওয়া গরুকে দেওয়া হচ্ছে অক্সিটোসিন ও গ্রোথ হরমোনের ইনজেকশন। যাতে বাছুরের অভাবে দুধের স্রোতে কোনো টান না পড়ে। অর্থাৎ দুধে অবাঞ্ছিত অনুষঙ্গ হিসাবে আমাদের গিলতে হচ্ছে অধিক পক্ষে স্বাস্থ্যসীমার ২০০ গুণ উর্ধ্বে পশুখাদ্যের কীটনাশক, পশুর রক্তের ৫২ ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক আর ৫৯ ধরনের বিভিন্ন ক্ষতিকারক হরমোন। দুধের মিশ্রিত গ্রোথ হরমোনের প্রভাবটা বিশেষ করে আলোচনার অবকাশ রাখে।

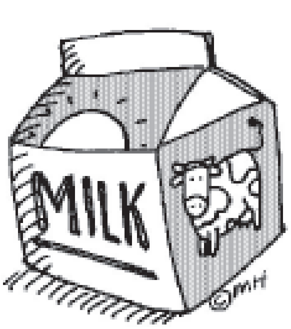

দেখো আমি বাড়ছি মাম্মি (বাড়ছে ভুঁড়ি, কোলেস্টেরল আর ক্যান্সার): দুধের সঙ্গে হরমোন ফ্রি। যেই বাছুর জন্মাল, বেচারা গরুর রক্তে ইনজেকশনের মাধ্যমে ঢোকানো হতে থাকল প্রায় ৫৯ ধরনের সক্রিয় হরমোন। অক্সিটোসিন হরমোন দিয়ে গরুর বাঁট নিংড়ে দুধের শেষ ফোঁটাটুকুও শুষে নেওয়া হতে থাকল মুনাফার চাহিদা মেটানোর জন্য। এর কোনোটাই মানুষের কাম্য নয়, ফাউ হিসেবে, কম্পিউটারের ভাইরাসের মতো, টেলিভিশনের সিনেমার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের মতো আমাদের গিলতে হচ্ছে এই সব হরমোন নামক প্রোটিন। ইনজেকশন না দেওয়া গরুর বা অন্যান্য গবাদি পশুর দুধে ইনসুলিন জাতীয় গ্রোথ ফ্যাক্টর ১ (Insulin like growth factor -1, IGF- 1) নামে এক হরমোন থাকে। জন্মের অব্যবহিত পরে বাছুরের বৃদ্ধিরও প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এটার দরকার নবজাতক পশুশিশুর স্বাভাবিক দ্রুত বৃদ্ধির জন্য। শৈশবের পরে এটা মানুষের শরীরে কিসের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে? হ্যাঁ, দুধপায়ীদের যে ভুঁড়িটি দেখা যায় তাতে দুধের এই হরমোনের একটা অবদান আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাত্র ৩ কাপ করে (৭০০ মিলিলিটার) দুধ পানে রক্তে IGF- 1-এর মাত্রা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। দুর্ভাবনার কথা এই যে, পাস্তুরাইজেশনে IGF- 1 অবিকৃত থেকে যায়। অবিকৃত IGF- 1 পাকস্থলির অ্যাসিড ও অন্ত্রের জারক রস হজম করতে পারে না, রক্তে মেশে। IGF- 1 অনিয়ন্ত্রিতভাবে কোষবিভাজন বাড়ায় ও ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ায়। যদিও

তথ্যপ্রমাণ নেই, সমালোচকদের বক্তব্য IGF- 1-এর অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিজাতীয় ক্রিয়ার ফলে দুগ্ধপায়ীদের স্তন, প্রস্টেট ও অন্ত্রের ক্যান্সার রোগ বৃদ্ধি ঘটার সম্ভাবনা আছে।

দুধ ও অ্যালার্জি: দুধের প্রোটিন শিশুদের অ্যালার্জির বড় কারণ। 'ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স' বলে একটা বৈশিষ্ট্যের কথা অনেকে হয়ত শুনে থাকবেন। দুধ হজম করার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক 'ল্যাকটোজ'-এর সম্পূর্ণ অথবা আপেক্ষিক অভাব ঘটলে দুধ হজম হয় না। অ্যালার্জি আলাদা হলেও এই দুই কারণে দুধ পানে অনেকের পেটে অস্বস্তি হয়, পেট ফাঁপে, পাতলা পায়খানা হয়। দই খেলে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সে ভুগতে হয় না বটে, তবে অ্যালার্জি থেকে পার পাওয়া যায় না। এছাড়া আছে অ্যালার্জির সমগোত্রীয় 'অটোইমিউন ডিজিজ'। মানুষের শরীরে বাইরে থেকে খাবার হিসেবে আমিষ জাতীয় প্রোটিন ঢুকলে অনেক সময় শরীরের রোগপ্রতিরোধ কর্মকাণ্ডের কাছে সেটা ভুল করে ক্ষতিকারক বলে মনে হয়। বিশেষ বিশেষ মাছ ডিম বা মাংসের ক্ষেত্রে আমাদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। দুধের ক্যাসিন ও ঐ ধরনের প্রোটিনের ক্ষেত্রেও এটা বিরল নয়। কৃত্রিম উপায়ে জিনের পরিবর্তন করা ও সংকর গবাদি পশুর দুধে এটা বেশি। এই প্রোটিনের বিরুদ্ধে রোগপ্রতিরোধকারী অঙ্গ থেকে নির্গত অ্যান্টিবডির সঙ্গে দুধের প্রোটিনের জোর লড়াই চলে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলে, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। উলুখাগড়া হিসাবে শরীরের অস্থিসন্ধিতে লড়াই হলে অস্থিসন্ধির প্রদাহ বা আর্থাইটিস, চামড়ার নীচে হলে অ্যালার্জি আর পৌষ্টিক তন্ত্রের ভেতরকার দেওয়ালে লড়াই চললে আন্ত্রিক রোগ বা ডায়ারিয়া। আন্ত্রিক রোগের মতো সমস্যা অবশ্য ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স-এও হয়। দুধে ল্যাকটোজ নামে এক ধরনের শর্করা থাকে, যেটা হজমের জন্য আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্রে ল্যাকটোজ নামে এক উৎসেচক নিঃসরণ হয়। মায়ের দুধের ল্যাকটোজ হজম হলেও অন্য দুধের ক্ষেত্রে সেটা হয় অকাজের অথবা অপ্রতুল। ফলে মলের সঙ্গে ল্যাকটোজ নামক শর্করা বেরিয়ে যায় আর সঙ্গে বেরিয়ে যায় প্রচুর জল ও জলে দ্রবীভূত ভিটামিন ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ।

> পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণে দুধে পাওয়া যায় গোময়, যেটা কিছু ধর্মাবলম্বীর কাছে পবিত্র হলেও স্বাস্থ্যকর নয় মোটেই। দুধেল গবাদি পশুর স্তনগ্রন্থির প্রদাহ বা ম্যাস্টাইটিস প্রায়ই হয়। অ্যান্টিবায়োটিক রোগজীবাণুর বোঝা কম করতে পারলেও রোগজীবাণুহীন করতে পারে না। দুধে পশুরক্তের শ্বেতকণিকা বা পুঁজের অস্তিত্বও নির্ণীত হয়েছে। ১ মিলিলিটার দুধে অধিক পক্ষে ৭৫০০০০ সংখ্যক পশুরক্তের শ্বেতকণিকার আর ২০০০০ সংখ্যক রোগজীবাণুর উপস্থিতি বিক্রয়যোগ্য বিধিসম্মত ছাড়পত্র পেয়ে যায়।

আগের মতো পাড়ার ঘোষবাড়ির গোয়ালে দু-চারটি যত্নে পালিত গরু-মোষের দুধ পাওয়া যায় না। খোলা হাওয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশে গরুর আয়ু ২০ বছর। দুধের কারখানায় অপরিণত বয়সে গরুকে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন করানো হয়। তার বাছুরকে বঞ্চিত করে, ১০ মাস ধরে অক্সিটোসিন হরমোন ইনজেকশন দিয়ে বাঁট নিংড়ে দুধ বার করে নেওয়া চলতে থাকে। এরপরেই চালু হয়ে যায় কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন। ৪-৫ বছরের মধ্যে সেই পশুটি পাকাপাকিভাবে রুগ্ণ হয়ে পড়ে ও প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন তার স্থান হয় কসাইখানায়, মাংস জোগানোর জন্য। অতি বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থার পশুগুলির লালন-পালন এখন যান্ত্রিক। সেখানে পশুখাদ্যে থাকে কীটনাশক, পশুকে নীরোগ রাখার জন্য অপ্রয়োজনে ব্যবহার হয় গাদা গাদা অ্যান্টিবায়োটিক আর বিভিন্ন জায়গা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংগৃহীত দুধের সংরক্ষণের কারণে প্রযুক্ত হয় রাসায়নিক ও একাধিকবার পাস্তুরাইজেশন প্রক্রিয়া। আমেরিকায় ৭১ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড গরম অবস্থায় রেখে দুধের পাস্তুরাইজেশন বিধিসম্মত হলেও সময় ও খরচ কমানোর জন্য আমাদের দেশে ১৩৮ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ১ সেকেন্ডেরও কম সময়ে গরম অবস্থায় রেখে পাস্তুরাইজেশন করা হয়। এর নাম হাই টেম্পারেচার শর্ট টাইম পদ্ধতি (HTST)। তাজা দুধের সরবরাহে টান পড়লে চাহিদা মেটানোর জন্য তাজা দুধের সঙ্গে গুঁড়ো দুধ, মাখন ও জল মিশিয়ে তৈরি হয়ে যায় টোন্ড বা ডাবল টোন্ড দুধ। দুধে রাসায়নিক ভেজালের কথা বইতে পাওয়া যাবে না, খবরের কাগজে আকচার বেরোয়। পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণে দুধে পাওয়া যায় গোময়, যেটা কিছু ধর্মাবলম্বীর কাছে পবিত্র হলেও স্বাস্থ্যকর নয় মোটেই। দুধেল গবাদি পশুর স্তনগ্রন্থির প্রদাহ বা ম্যাস্টাইটিস

প্রায়ই হয়। অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সেজন্যই। কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক রোগজীবাণুর বোঝা কম করতে পারলেও রোগজীবাণুহীন করতে পারে না। দুধে পশুরক্তের শ্বেতকণিকা বা পুঁজের (pus) অস্তিত্বও নির্ণীত হয়েছে পরীক্ষাগারে। ১ মিলিলিটার দুধে অধিক পক্ষে ৭৫০০০০ সংখ্যক পশুরক্তের শ্বেতকণিকার আর ২০০০০ সংখ্যক রোগজীবাণুর উপস্থিতি বিক্রয়যোগ্য বিধিসম্মত ছাড়পত্র পেয়ে যায়।

গরুর দুধ, টোন্‌ড ও ডাবল টোন্‌ড দুধ: আমাদের দেশের বাজারে খাঁটি গরুর দুধের চাহিদা কম আর দামও বেশি। দেশের বাইরে টোন্‌ড দুধের প্রচলন নেই। দুধের চাহিদা আর তাজা দুধের জোগানের বৈষম্যের জন্য বিশেষ করে আমাদের দেশেই টোন্‌ড দুধের ব্যবহার হয়। কোনো কোনো সময়ে বা কোনো কোনো স্থানে দুধ চাহিদার চেয়ে বেশি উৎপন্ন হলে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে হয়। বেশি ফ্যাটের জন্য (৭-৮ শতাংশ) মোষের দুধেরও চাহিদা কম। মোষের দুধ ও কোনো কোনো সময়ে অবিক্রিত গরুর দুধ থেকে জলীয় অংশটি বাদ দিয়ে প্রথমে মাখন তুলে ও তারপরে দুধের মধ্যে ভেসে বেড়ানো (suspended) পদার্থগুলো আলাদা করে পাউডার অবস্থায় রাখা হয়। স্থান ও কাল ভেদে দুধের অকুলান হলে কিছুটা চর্বি নিষ্কাশিত (স্কিম্‌ড্) তাজা দুধের সঙ্গে দুধের পাউডার, মাখন ও জল মিশিয়ে প্রায় তাজা দুধের মতো করে নেওয়া হয়। একটু আপস মেনে নিয়ে এই টোন্‌ড দুধই একটা বিলাসিতাহীন উদরপূর্তির উপায়। দুধের ব্যাপারিরা জানে, দুধের চর্বি নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় স্কিমড্ দুধ তৈরি করার চেয়ে পুনর্নির্মিত (টোন্‌ড) দুধই সহজলভ্য ও সস্তা। স্কিম্‌ড্ দুধ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর, প্রস্তুত করার খরচ বেশি ও স্বাদের দিক দিয়ে কম আবেদনের। এইজন্য টোন্‌ড দুধের ব্যবসা লোভনীয়। তাজা গরুর দুধে ৩.৫ শতাংশ ফ্যাট থাকে। টোন্‌ড দুধে ফ্যাটের পরিমাণ কম, ২.৫ শতাংশ। দুধ পুনর্নির্মাণের সময় মিশ্রিত মাখনের পরিমাণ আরও কমিয়ে ১.৫ শতাংশ রাখলে সেটা হয়ে যায় ডাবল টোন্‌ড দুধ। আমাদের দেশে যে নামীদামি প্রস্তুতকর্তার বেশি দামি স্কিমড্ দুধ পাওয়া যায় তাতে ফ্যাটের পরিমাণ থাকে ০.২ থেকে ০.৫ শতাংশ।

দুধেল দুধের সওদাগরের রক্তচক্ষু: ওপরের প্রয়াসটি কেবল পরিবর্তনশীল, সদা উৎকর্ষের প্রতি সচেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ালব্ধ তথ্যের নিবেদন। এর পরে আছে ব্যাক্তিগত ও গোষ্ঠীগত বিশ্বাস জন্মানো। পরের বাধা, অভ্যাসের পরিবর্তন, যেটা সহজ নয়। প্রবল বাধা আসবে দুধ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ধূমপানের অপকারিতা আজকের দিনে বিতর্কের ঊর্ধ্বে হলেও তামাকের ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। মেক্সিকোর গির্জায় ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ধূমপানের নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও দীর্ঘ ৪০০ বছরের অর্ধেক সময় ধরে ধূমপান বিরোধী প্রতিরোধ বলবৎ রাখতে হচ্ছে। স্বাস্থ্যের ওপর ধূমপানের কুপ্রভাব বিজ্ঞানীরা জানবার পরে সিগারেট প্রস্তুতকর্তাদের দিক দিয়ে সেই তথ্যকে চাপা দেবার প্রবল চেষ্টা হয়েছিল।

গরুর দুধ মানুষের জন্য সৃষ্ট হয় না। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আদিম মানুষ ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা জোগানের জন্য স্বকীয় নতুন নতুন খাদ্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় অন্য কোনো প্রজাতির দুধ পানে অভ্যস্ত হয়েছিল। মানুষ ছাড়া আর অন্য কোনো প্রাণী শৈশবের পরে দুধ পান করে না, কারণ সেটা অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক। প্রাকৃতিক খাদ্যশৃঙ্খলের ভারসাম্য রক্ষার কারণে গরুর দুধ আর সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো কেবল বাছুরের জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য তৈরি হয়। জন্মের এক সপ্তাহ পরে বাছুরের ওজন আটগুণ বাড়ার কথা। সেই কারণে তার দুধে এত চর্বিজাতীয় পদার্থ ও ইনসুলিন জাতীয় গ্রোথ ফ্যাক্টর-১ থাকে। মানুষের বিকৃত খাদ্যরুচির জন্য জন্মের এক বা দুই দিন পরে বাছুর আর দুধ পান করতে পারে না। জন্মের পরে বাছুরের মতো মানুষের ওজন বৃদ্ধির তাড়না নেই। মানব শরীরের জৈবিক বৈশিষ্ট্যগত কারণে বাছুরের জন্য সৃষ্ট দুধপান করতে থাকলে উপকার কিছুই হবে না। সেই অপ্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসের জন্য আপস করতে হবে বদহজম, অ্যালার্জি, অস্বাস্থ্যকর উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল ও স্থূলতার সঙ্গে। প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর পৌস্টিক তন্ত্র নিজ নিজ প্রজাতির মাতৃদুগ্ধ পানের মতো করে তৈরি। মানব শরীরের জৈবিক প্রক্রিয়া সেই নিয়মের বাইরে থাকতে পারে না। একটি নবজাতক শিশুর কাছে তার মায়ের দুধ তার মায়ের অথবা বিকল্প হিসেবে দুধের জোগান আছে এমন কোনো ধাত্রীমায়ের দুধ শ্রেষ্ঠ খাদ্য। মায়ের দুধ আর গরুর দুধে বিস্তর ফারাক। গরুর দুধও বেশ ভাল পানীয়, তবে কেবল বাছুরের কাছে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, 'দুধ পান করেছেন?' উত্তর দিন, 'না, দুধের চেয়ে ভাল খাবারের সন্ধান পেয়েছি।'

উমা

এল নিনো ও পৃথিবীর উষ্ণায়ন

কুমারেশ মিত্র

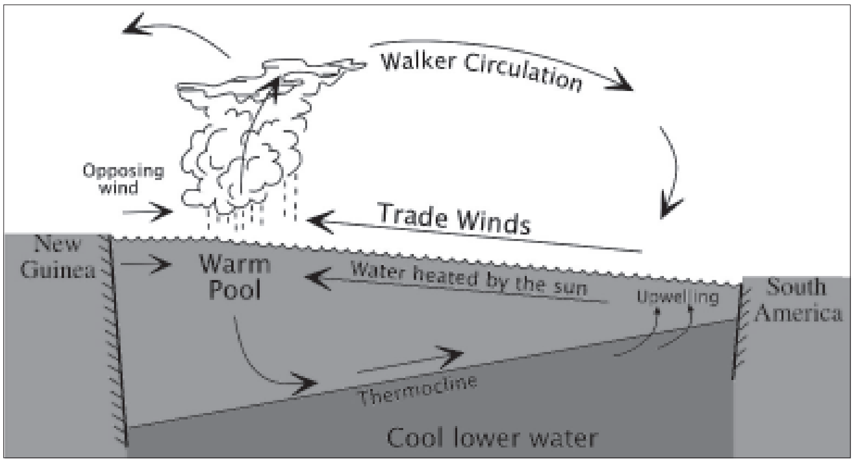

স্কেপটিক্যাল সায়েন্স-এর পত্রিকার ব্লগ পোস্টে ডঃ কেভিন ট্রেনবার্থ ও অন্য দুজন লিখেছেন, যদিও ১৯৯০ দশকের শেষ থেকে ভূ-উষ্ণায়ন খুব কমে গিয়েছে বা প্রায় থেমে গিয়েছে, তবু মনুষ্য সৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়ন কিন্তু গভীর সমুদ্রে ঘটেই চলেছে।[১] গত কয়েক বছর ধরে সংশয়বাদীদের (স্কেপটিক্স) প্রত্যয় জন্মানোর জন্যে পত্রিকার ব্লগ পোস্টে এই ধরনের আরও লেখা ছাপা হয়েছে। কেভিন ট্রেনবার্থও বর্তমানে তাঁর অনেক লেখায় স্বীকার করেছেন, ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণায়নে আবহাওয়া তন্ত্রে (ক্লাইমেট সিস্টেম) প্রকৃতিজাত পরিবর্তনশীলতা (natural variability) খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়।[২] ভূ পৃষ্ঠ, সমুদ্র, পর্বত, বায়ুমণ্ডল, মেঘ, হিমবাহ, গাছপালা ও প্রাণিকূল তাপ ও শক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে এবং এদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আবহাওয়া ব্যবস্থাকেই আমরা আবহাওয়া-তন্ত্র বলি।

সূর্য থেকে আসা আলোর বর্ণালি ৫০-৫১ শতাংশ জুড়ে থাকে স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ ও দৃশ্যমান আলো যা স্বচ্ছ বায়ুমাধ্যম ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে শোষিত হয়। তা আবার ভূ-উষ্ণতার ওপর নির্ভর করে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ ও তাপশক্তি হিসাবে নিঃসৃত হয়। আবহাওয়া তন্ত্রে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু স্তরে উপস্থিত জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ইত্যাদি গ্যাস এইসব দীর্ঘ তরঙ্গের বিকিরণ ও তাপশক্তি শোষণ করে নেয়। আবার তা বিকিরণ প্রক্রিয়ায় বাতাসে সব দিকে নিঃসরণ করে। এইরকম পুনঃপুনঃ শোষণ ও বিকিরণ প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এই ঘটনাকে গ্রিন হাউস প্রভাব বলা হয়, এতে অংশগ্রহণকারী উপরি উক্ত গ্যাসসমূহকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলা হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট জলীয় বাষ্পকে বাদ দিলে মনুষ্যসৃষ্ট গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসই ভূ-উষ্ণায়নে সবচেয়ে বড় অংশগ্রহণকারী। যদিও বাতাসে গ্রিন হাউস প্রভাবে শতকরা ৯৫ শতাংশের জন্যে দায়ী জলীয় বাষ্প, বাকি গ্যাসগুলি মাত্র ৫ শতাংশ গ্রিন হাউস প্রভাব সৃষ্টি করে। তাই বাতাসে গ্রিন হাউস মূলত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাবে মনুষ্যসৃষ্ট গ্রিন হাউস প্রভাবে ভূ-উষ্ণতা ততই বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু গত ১৬ বছর বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ অনেক গুণ বেড়ে গেলেও ভূ-উষ্ণায়ন হয়েছে নগণ্য, ০.০৩° সে. প্রতি দশকে, যেখানে আই পি সি সি-র ক্লাইমেট মডেলগুলির ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ০.১৬ সে. প্রতি দশকে।

পুরনো সময়ের ক্লাইমেট মডেল এবং বর্তমানকালের মডেলগুলির ভূ-উষ্ণায়নে এই ধারাবাহিকতায় ছেদ বা প্রায় স্তব্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারে না। এর কারণ ক্লাইমেট মডেলগুলিতে ভূ-উষ্ণায়নে শুধু গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির উষ্ণায়ন সৃষ্টির তথ্যই দেওয়া আছে। সৌর কলঙ্ক ও পৃথিবীতে পৌঁছনো সূর্যশক্তির সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনশীলতা, শক্তি স্থানান্তরে এল নিনোর মতো প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহের বিবেচনা মডেল প্রক্রিয়ায় করা হয় নি। আবার কোথাও খুব সাম্প্রতিককালে

এই ধরনের প্রয়াস শুরু করার কথা ভাবা হচ্ছে।

এল নিনো লা নিনা

এল নিনো বলতে আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের জলের উপরিতলের ২-৭ বছর অন্তর প্রায় সারা পৃষ্ঠ জুড়ে বৃহদাকারে উষ্ণায়নকে বুঝি, যা সাধারণত ৯-১২ মাস কখনও বা ১৮ মাস অবধি স্থায়ী হয় এবং সারা পৃথিবী জুড়ে আবহাওয়াকে আচমকা প্রভাবিত করে। এটা খুবই অনিয়মিতভাবে ঘটে।

আসলে এল নিনো-সাদার্ন অসিলেশন্ (এন্‌সো) একটি প্রাকৃতিক দোলন: নিরক্ষরেখার প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের সমুদ্র তাপমাত্রা একটি স্বাভাবিক মান থেকে ওঠা-নামা করে একটি দোলন সৃষ্টি করে। এল নিনোর বৈশিষ্ট্য হল, মধ্য এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার তুলনায় নিরক্ষরেখায় সমুদ্র অঞ্চলে এক অস্বাভাবিক উষ্ণ তাপমাত্রা বজায় থাকে। এল নিনোকে এন্‌সো দোলনের উষ্ণ দশা বলা হয়। এর শীতল দশা লা নিনার সময় সমুদ্র শীতলতর থাকে ও তাপমাত্রা স্বাভাবিক মানের চেয়ে কম হয়। স্বাভাবিক এল নিনোহীন অবস্থায় বাণিজ্যবায়ু (ট্রেড উইন্ড) ক্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে বয়ে যায় এবং সমুদ্রের জলরাশি পশ্চিমে ইন্দেনেশিয়ার দিকে টেনে নিয়ে যায়। ফলে এল নিনোর সময়ে ইন্দোনেশিয়ার দিকে টেনে নিয়ে যায়। ফলে এল নিনোর সময়ে ইন্দোনেশিয়ার তীরে উষ্ণ সমুদ্রতল দক্ষিণ আমেরিকায় ইকোয়েডরে তুলনায় অর্ধ মিটার ওপরে উঠে যায় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ তাপমাত্রা পূর্বের দক্ষিণ আমেরিকার উপকণ্ঠে প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় ৮° সে. বেড়ে যায়। এর অন্য কারণটা হল সমুদ্রের জল বাণিজ্যবায়ু বাহিত হওয়ায় সমুদ্রতলের নিচের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জল ওপরে উঠে আসে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ তাপমাত্রা কমে যায়।[৩]

লা নিনা দশার সময় সমুদ্র প্রায় মেঘমুক্ত আকাশ থেকে আগত সূর্যকিরণে 'চার্জ' হয়, এল নিনো দশার সময় এই শোষিত বিকিরণ সমুদ্র থেকে 'ডিস্‌চার্জ' হয়ে বিশাল পরিমাণের তাপশক্তি হিসাবে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। লা নিনার আরও কাজ হল, এল নিনোর সময়ে পড়ে থাকা উষ্ণ জল বাণিজ্য বায়ুতে বহন করে অন্য সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া। সবশেষে এক কথায় লা নিনা + এল নিনো = এন্‌সো হল একটি বিশৃঙ্খল প্রাকৃতিক চক্র।[৪]

তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে পৃথিবীর উষ্ণায়নে আই পি সি সি-র গ্রিন হাউস উষ্ণায়নের তত্ত্ব ছাড়া, এল নিনোজাত তাপশক্তিরও গভীর প্রভাবই থাকার কথা। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মলগ্ন ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে এল নিনোর হদিশ মানুষের কাছে আছে। গত শতাব্দীর ৭০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ৯০ দশকের শেষ অবধি এল নিনো পৃথিবীর আবহাওয়ায় আধিপত্য করেছে। তখন উষ্ণায়নে গ্রিন হাউস তত্ত্বের সমর্থক ডঃ ট্রেনবার্থ ও তাঁর অনুগামীরা কেউ এল নিনোর উল্লেখ করেন নি। এখন ১৬ বছর জুড়ে ভূ-উষ্ণায়নে ছেদ পড়ায় ডঃ ট্রেনবার্থ ও তাঁর সঙ্গীরা আবহাওয়া তন্ত্রে প্রকৃতিগত পরিবর্তনশীলতার কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন, এই তন্ত্রের একাংশ বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস প্রভাবে উৎপন্ন তাপশক্তির প্রায় ৯০ শতাংশ অন্য অংশ সমুদ্রের গভীরে চলে যাচ্ছে।[৫] তবে দেখানো যায়, পৃথিবীর উষ্ণায়নে এল নিনোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। গত শতাব্দীতে ১৯৯৭-৯৮ সালের এল নিনো ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। ওয়ার্ল্ড মেটিরিওলজিক্যাল অর্গানাইজেশন-এর অভিমত অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে রেকর্ড উচ্চ ভূ-তাপমাত্রার জন্যে এই এল নিনো ছিল সবচেয়ে বড় কারণ। তাই ১৯৯৮ সালে সারা পৃথিবী জুড়ে স্থলভূমি ও সমুদ্রের গড় তাপমাত্রা ১৯৬১-১৯৯০-এর গড় তাপমাত্রা ৬১.৭° ফাঃ-এর চেয়ে ০.৮° ফাঃ (০.৪৪°সেঃ) বেশি ছিল। আবার ন্যাশনাল ওসিওনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এন ও এ এ)-র মত অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে স্থল ও সমুদ্রের উষ্ণতার মান এই সময় পর্যন্ত সমস্ত ভূ-তাপমাত্রার মানকে ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং তা ছিল ১৮৮০ সাল থেকে মাপা দীর্ঘমেয়াদি গড় ভূ-তাপমাত্রা ৫৬.৯° ফাঃ (১৩.৮° সে)-র চেয়ে ১.২° ফাঃ বা ০.৭°সেঃ বেশি।[৬] এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে বিংশ শতাব্দীতে মূলত বাতাসে ক্রমবর্ধমান হারে শুধু মনুষ্যসৃষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ক্রমান্বয়ে নিঃসরণের ফলে ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্পর্কে আই পি সি সি-র তৃতীয় মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (২০০১) লেখা মান যা ছিল, গত এক শতাব্দীতে মাত্র ০.৬° সেঃ বা ১.১° ফাঃ। তাহলে এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, পৃথিবীর উষ্ণায়নে এল নিনো গ্রিন হাউস প্রভাবের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে না। তবে ট্রেনবার্থ ও গ্রিন হাউস উষ্ণায়নের সমর্থকেরা মনে করেন, বাতাসে গ্রিন হাউস প্রভাবজাত তাপশক্তি সমুদ্রের গভীরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এল নিনো সৃষ্টি করছে। এই আলোচনায় আমরা পরে ফিরব। আপাতত শুধু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বায়ুমণ্ডলের গ্রিন হাউস প্রভাবজাত তাপের শতকরা ৯০ ভাগ সমুদ্রের গভীরে চলে যায়— যদি এই সিদ্ধান্ত সঠিক ধরে নেওয়া হত, তবে তা সমুদ্র জলের তাপমাত্রায় অতীব সামান্যই বৃদ্ধি ঘটাতে

পারে। কেন না, সমুদ্র জলের তাপগ্রাহিতা তুলানমূলকভাবে অনেক বড় সংখ্যা।[৭]

সমুদ্রে গ্রিন হাউস উষ্ণায়নের প্রভাব

বব টিস্‌ডেল সমুদ্র সম্পর্কিত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, উত্তর অ্যাটলান্টিক বা অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে ২০০ মিটার গভীরতা অবধি একবিংশ শতাব্দীতে কোনো উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় নি যদিও বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাস বিশেষত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। (সমুদ্র তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা: প্রশান্ত মহাসাগরে ০.০০০৫° সেঃ প্রতি দশকে, উত্তর অতলান্তিকে ০.০° সেঃ প্রতি দশকে)। তাহলে এই দুই মহাসাগরে মনুষ্যসৃষ্ট গ্রিন হাউস গ্যাসজাত তাপশক্তির কোনো প্রভাব পড়ে নি, আবার ভূ-তাপমাত্রাও বাড়ে নি। কিন্তু ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ অতলান্তিকের তাপমাত্রা বেড়েছে প্রতি দশকে যথাক্রমে ০.০০৬৭° সে ও ০.০৫৫° সে হারে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির এই তথ্যের নিরিখে মনে হতে পারে, উত্তর আতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের অভ্যন্তরে বাতাসে গ্রিন হাউস উষ্ণায়নে উদ্ভূত তাপ মোটেই প্রবেশ করে না, কিন্তু ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ অতলান্তিকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিছু উল্টোই। বব টিস্‌ডেলের অভিমত হল, প্রথম দুটি সমুদ্রের ওপর গ্রিন হাউস গ্যাসের কোনো প্রভাব নেই, দ্বিতীয় দুটির ক্ষেত্রে আছে, এরকম অবৈজ্ঞানিক পক্ষপাত হতে পারে না, এর অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। সে কারণটি হল: প্রশান্ত মহাসাগরে এন্‌সো-র উষ্ণ দশা ২০০৬-০৭ এবং ২০০৯-১০-এর এল নিনো ঘটে যাওয়ার পরে এন্‌সো-র শীতল দশা তার পিছু পিছু ধেয়ে আসা লা নিনার আবির্ভাবের সময়ে, স্বাভাবিকের চেয়ে শক্তিশালী বাণিজ্যবায়ু (ট্রেড উইন্ড) এল নিনোর উষ্ণ জল বহন করে নিয়ে পূর্ব ভারত মহাসাগরে পৌঁছে দেয়। এছাড়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর থেকে উষ্ণ জল অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির মধ্যস্থিত টরেস প্রণালী দিয়ে অন্য সমুদ্র পূর্ব ভারত মহাসাগরে চলে যায়।[৮] ফলে ভারত মহাসাগর ও অনুরূপ কারণে দক্ষিণ অতলান্তিক মহাসাগর উষ্ণতর হয়ে পড়ে। এই উষ্ণায়ন অবশ্যই গ্রিন হাউস উষ্ণায়ন নয়। তাহলে পৃথিবীর সমুদ্রে গ্রিন হাউস উষ্ণায়নের ছাপ কোথায়?

বব টিস্‌ডেলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ১৯৭৯ থেকে উপগ্রহযুগের সমুদ্রপৃষ্ঠ তাপমাত্রা এবং তাঁর গণনা করা সমুদ্র অভ্যন্তরের তাপ সম্পর্কীয় তথ্য মনুষ্যসৃষ্ট গ্রিন হাউস উষ্ণায়নের কোনো সাক্ষ্য দেয় না। সাধ্য দেয় প্রকৃতিগত পরিবর্তনশীলতার।

কেভিন ট্রেনবার্থ ও বব টিস্‌ডেল যথাক্রমে স্কেপটিক্যাল সায়েন্স এবং Watts up with that (WUWT)-এর ব্লগ্‌ লেখক। আলেক্সা স্ট্যাটিস্টিকস্‌ অনুযায়ী দ্বিতীয়টির ইন্টারনেট শ্রোতা বা দর্শক প্রথমটির চেয়ে অনেক বেশি এবং তা গুগ্‌ল-এ পরে দ্বিতীয় স্থান দখল করে। তাই বিজ্ঞানে সত্য অনুসন্ধানের স্বার্থে কেভিনকে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় এককভাবে বা দ্বিপাক্ষিকভাবে বা অন্য কোনো উপায়ে তাঁর তোলা বিষয়গুলো নিয়ে গত এপ্রিলের শেষ থেকে বব অন্তত দুবার WUWT-তে লেখার মাধ্যমে আলোচনায় আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের ধারণা, উৎসুক জনমানসকে সামনে রেখে এই দুই অভিজ্ঞ আবহাওয়া বিজ্ঞানীর পারস্পরিক মতবিনিময়, আলাপ আলোচনা ভূ-উষ্ণায়নের রহস্য ভেদে বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ছ মাস সময়ে উভয়ের মধ্যে কোনোরকম বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত আজও ঘটে ওঠে নি। বাতাসে গ্রিন হাউস উত্তাপই ভূ-উষ্ণায়নে একমাত্র শক্তি এই তথ্যের প্রবক্তাদের মধ্যে নেতৃত্বকারী বিজ্ঞানীদের বিশেষ করে কেভিন ট্রেনবার্থকে সত্যের সন্ধানে এগিয়ে আসতে হবে। ডঃ ট্রেনবার্থ এই সংক্রান্ত তাঁর সাম্প্রতিক পেপারগুলিতে এক বিশেষ বিশ্লেষণের (ECMFW-S_4 reanalysis) ওপর খুব বেশি নির্ভর করেছেন। তাই তাঁকে ক্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলপৃষ্ঠে নিম্নমুখী আধোগামী (ডাউন ওয়েলিং) ক্ষুদ্র তরঙ্গ বিকিরণ এবং দীর্ঘ তরঙ্গ বিকিরণের (যা গ্রিন হাউস প্রভাবেও উৎপন্ন হয়) পরিমাণ রেকর্ডের সাহায্যে প্রমাণ দিয়ে দেখানো উচিত সত্যি সত্যি উভয়ের মান কত এবং আদৌ গ্রিন হাউস গ্যাস উদ্ভূত দীর্ঘ তরঙ্গের বিকিরণ বেশি পরিমাণে সমুদ্রে পৌঁছে কিনা।

এল নিনো ও ভূ-উষ্ণায়নে উচ্চ লম্ফন

ট্রেন বার্থের প্রস্তাবনা

রয়্যাল মেটিওরোলজিক্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধে ট্রেনবার্থ তিনটি ১০ বছরের সময় পর্বের উল্লেখ করেছেন, ‘যখন ভূ-উষ্ণায়ন স্তব্ধ হয়েছিল (hiatus): ১৯৭৭-১৯৮৭ থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০১-২০১২। আবার এই প্রতিটি পর্যায়ের শেষে (উষ্ণায়নে) উচ্চ লম্ফন ঘটেছিল।’ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথম দুটি দশ বছরের হলেও তৃতীয়টি ১২ বছরের। তবে ট্রেনবার্থই প্রথম আবহাওয়া বিজ্ঞানী, যিনি বিংশ শতাব্দীর শেষে অনুষ্ণায়নের (নো ওয়ার্মিং) তিনটি পর্যায় সনাক্ত করেছেন। যাদের প্রত্যেকটি শুরুতে ও শেষে পৃথিবীর উষ্ণায়নে একটা করে উচ্চ লম্ফন ঘটে গিয়েছে।

কিন্তু ট্রেনবার্থ তাঁর উপরে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে উষ্ণায়নে এই উচ্চ লম্ফনের কারণ উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তা খুব বিস্ময়ের। কেন না, প্রথম উচ্চ লম্ফন ১৯৭৬ সালের প্রশান্ত মহাসাগরীয় আবহাওয়ার ত্বরিত পরিবর্তনের (ক্লাইমেট শিফ্‌ট) সঙ্গে মিলে গিয়েছে এবং উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ঘটেছে ১৯৮৬-৮৭-৮৮ এবং ১৯৯৭-৯৮-এর এল নিনোর সময়কালে। ১৯৭৬ সালের আবহাওয়া পরিবর্তনে পৃথিবীর সমুদ্র অঞ্চলের তাপমাত্রা আকস্মিকভাবে ০.২২° সেঃ বেড়ে গিয়েছিল। এটা খুবই একক ঘটনা এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব বা মতামত আছে। বিজ্ঞানী মহলে এ বিষয়ে কোনো ঐকমত্য নেই।[৯]

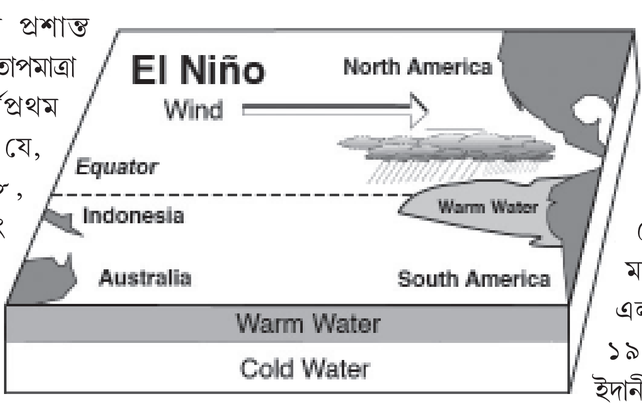

বব টিস্‌ডেল অতলান্তিক, ভারত মহাসাগর ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নিয়ে কাজ করে সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন যে, ১৯৮৬-৮৭-৮৮, ১৯৯৭-৯৮ এবং ২০০৯-১০ সালে এল নিনো ঘটার সময় ট্রেনবার্থ লেখচিত্রের মতো প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমুদ্রপৃষ্ঠ তাপমাত্রায় এক উল্লম্ফন ঘটেছে, কেন না এল নিনোয় উদ্ভূত বিশাল পরিমাণ তাপ সমুদ্রপৃষ্ঠে ও বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা খুব বাড়িয়ে দেয়। তুলনায় ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৯১-এর এল নিনোর সময় সমুদ্র তাপমাত্রার আকস্মিক বৃদ্ধি বেশ কম। এর কারণ ১৯৮২ সালে এল চিচেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ প্রথম ক্ষেত্রে বাতাস ও সমুদ্রের তাপমাত্রার আকস্মিক পরিবর্তনকে প্রশমিত করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১৯৯১ সালে মাউণ্ট পিনাটুবোর বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎগমের প্রভাবে একইভাবে এল নিনোর সময়কালে উষ্ণায়ন প্রশমিত হয় এবং তা গভীর ও প্রতিফলিত রশ্মির মতো কয়েকটি ক্ষুদ্র লম্ফনে পর্যবসিত হয়, কেন না এই সময়ে ১৯৯৩, ৯৪ সালেও প্রশান্ত মহাসাগরের এল নিনোর আবির্ভাব ঘটে।[৯]

এল নিনোর প্রভাবে ভূ ও সমুদ্র তাপমাত্রায় উচ্চ লম্ফনের এই প্রাকৃতিক কারণ মনুষ্যসৃষ্ট গ্রিন হাউস গ্যাসের ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্বের ভিতকে বেশ দুর্বল করেই দেয়। গ্রিন হাউস গ্যাস তাপ কোনো এক বছর বাতাসের তাপমাত্রায় আপেক্ষিকভাবে বিশাল আকস্মিক পরিবর্তন ঘটায় এবং পরবর্তী ১০-১২ বছর আবার বাতাসের গড় তাপমাত্রা এই নতুন পরিবর্তিত মানেই স্থির থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আরেকটি বড় এল নিনোর জন্ম সমুদ্রপৃষ্ঠ তাপমাত্রায় আরেকটি উল্লম্ফন ঘটায়, এইরকম অবস্থা গ্রিন হাউস গ্যাস তত্ত্ব অনুসরণ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তা করা খুবই দুরূহ। কেন না এই ১০/১২ বছর সময়ে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কয়েকগুণ বেড়ে যায় এবং গ্রিন হাউস গ্যাস উষ্ণায়নের তত্ত্ব অনুযায়ী উদ্ভূত তাপের পরিমাণেও যেমন অবিরাম অনেক বৃদ্ধি ঘটার কথা, তেমন সময়ের সাথে ভূ ও সমুদ্র তাপমাত্রার লেখচিত্র অবিরাম ওপরে উঠে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা ঘটে নি। ট্রেনবার্থ স্বীকার করে নিয়েছেন, ভূ-তাপমাত্রায় দুটি উচ্চলম্ফনের মধ্যে একটি তাপমাত্রা নয়, পরিবর্তনের সময় কাল আছে এবং এখন তথ্য দেখাচ্ছে, উক্ত উচ্চ লম্ফনগুলি প্রাকৃতিক কারণেই ঘটেছে, এখানে যেমন তা সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় অর্থাৎ এল নিনোয় উদ্ভূত তাপ। ১৯৯৭-৯৮ সালের ইদানীংকালের সর্ববৃহৎ এল নিনো ঘটার পর থেকে গত ১৬ বছর ধরে ভূ-তাপমাত্রায় স্তব্ধতা চলছে। ট্রেনবার্থের ধারণা আর কয়েক বছরের মধ্যে আবার একটা উচ্চ লম্ফন ঘটতে পারে। তখন দেখতে হবে প্রশান্ত মহাসাগরে এল নিনোর আবির্ভাব ঘটেছে কি না।

১৯৭৯ সাল থেকে উপগ্রহ মাধ্যমে ভূ ও সমুদ্রপৃষ্ঠ তাপমাত্রা মাপা শুরু হওয়ার পর থেকে একমাত্র পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর পৃষ্ঠের তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় নি এবং এতে কোনো উচ্চ লম্ফন নেই পূর্বে উল্লিখিত অতগুলি এল নিনো ঘটা সত্ত্বেও। বব্ টিস্‌ডেল এর কারণ হিসাবে বলেছেন, কেবলমাত্র পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে এন্‌সো-র উষ্ণ দশা এল নিনো অনুসারী যে শীতল দশা লা নিনার সৃষ্টি হয় তার ভূ-তাপমাত্রার ওপর প্রভাব ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণে ভূ-তাপমাত্রার ওপর এল নিনোর প্রভাবের সমানুপাতিক। তাই প্রতিটি এন্‌সো চক্রে এল নিনো, লা নিনা মিলে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর পৃষ্ঠের তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। কিন্তু অতলান্তিক, ভারত মহাসাগর ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে

লা নিনা পূর্বসূরী এল নিনোর ঠিক বিপরীত মাপের হয় না, বেশ ক্ষুদ্রতর হয়। তাই তাপমাত্রায় একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। আবার যখন শক্তিশালী এল নিনো প্রশান্ত মহাসাগরে বিরাজ করে না, তখন সমুদ্রপৃষ্ঠ ও ভূ-তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না বললেই চলে বা খুব সামান্য পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে ট্রেনবার্থ ও টিস্‌ডেলের লেখচিত্র দুইটির অধ্যয়ন এই সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীর উষ্ণায়নের এক মুখ্য কারণ এল নিনো উদ্ভূত তাপ এবং পৃথিবীর সমুদ্র সমূহ প্রাকৃতিক উপায়েই (এক্ষেত্রে এল নিনোর মাধ্যমেই) উষ্ণ হয়েছে। মনুষ্যসৃষ্ট গ্রিন হাউস গ্যাসজাত (ডাউন ওয়েলিং) অধোগামী উচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ শুধু সমুদ্রে বাষ্পায়নের বৃদ্ধি ঘটায়। এটা মনে রাখা দরকার, অবলোহিত বিকিরণ সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরের মাত্র কয়েক মিলিমিটার অবধি ভেদ করতে পারে যেখান থেকে বাষ্পায়ন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।[১০]

তাই কেভিন ট্রেনবার্থ যিনি বর্তমান সময়ের ভূ-উষ্ণায়নে ১০/১২ বছরের অপরিবর্তন ও তার শেষে এক উচ্চ লম্ফনের কথা বলেছেন, অথচ এল নিনোর মতো কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে এই লম্ফনের সম্পর্ক টানেন নি, তিনি যদি বব্ টিস্‌ডেলের এ বিষয়ে প্রস্তাবনাটি ভেবে দেখেন এবং উভয়ে যদি বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় বিজ্ঞানসম্মত ধারায় আলোচনায় ব্রতী হন, তাহলে আবহাওয়া পরিবর্তন বিজ্ঞান বাঁধন খুলে এগিয়ে যেতে পারে। অযথা সত্য, মিথ্যা পারস্পরিক দোষারোপে এই বিজ্ঞানের রাস্তা অনেকাংশে কণ্টকিত হয়ে পড়েছে। সুধী পাঠক এই প্রসঙ্গে আবহাওয়া বিজ্ঞানে 'ক্লাইমেট্‌গেট্' কেলেঙ্কারি, যা আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্সের তদন্তে বিজ্ঞানে এক অসৎ আচরণ হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে, তার বিবরণ ইন্টারনেটে, বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞান পত্রপত্রিকায় দেখে নিতে পারেন। পরিশেষে, ভূ-উষ্ণায়নের তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে মুক্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক আলোচনা শুরু হোক, এই আবেদন নিয়ে যেন আমাদের অনন্ত প্রতীক্ষায় কাটাতে না হয়।

তথ্যসূচি:

১। Warming Oceans consistent with rising sea level & global energy imbalance, Sceptical Science, posted on 29 January, 2014 by dann 1981, Rob Painting, Kevin Trenberth. (উল্লেখ - 1V)

২। Open Letter to Kevin Trenberth - NCAR, dt. 4.30.2014, by Bob Tisdale - Climate Observations, Blog Post at Watts Up withs that (WUWT) (উল্লেখ : ৪,৭)

৩। El Nino articles on the internet: a) The El Nino Phenomenon : From Understanding to predicting (released November 2004) by Yekaterina Glebushko. b) The El Nino Southern Oscillation (ENSO) [Updated to 31st July, 2008] by John L Daly. c) Climate Observations by Bob Tisdale at Blog Post at WUWT and other articles. (উল্লেখ : ৩, ৬ ...)

৪। Has Global Warming stalled? by Kelvin Trenberth, Published on Royal Meteorological Society (http//www.rmets.org) (উল্লেখ : ২, ৫)

৫। Open Letter to Royal Meteorological Society Regardding Dr. Tenberth's Article "Has Global Warming Stalled"? by Bob Tisdale, dt. 6.16.2014, Watts Up With That? (উল্লেখ : ৮, ৯, ১০)

রজতজয়ন্তী বর্ষে চেতনা-র বিজ্ঞানমেলা

প্রতিবেদন: হাতিবাগানে ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ৪ জানুয়ারি ২০১৫ বিজ্ঞানমেলা হয়ে গেল। 'চেতনা' আয়োজিত এই মেলা এবার ২৫ বছরে পড়ল। মেলার আমন্ত্রণ পত্রে লেখা 'ধর্ম যখন বিজ্ঞানকে বলে: 'রাস্তা ছাড়ো'! বিজ্ঞান কি রাস্তা ছেড়ে দেয়?' এই মেলার চরিত্র বুঝতে এটুকুই যথেষ্ট। বিশেষ প্রদর্শনীতে 'আয়না ও আলোর কারসাজি', 'ঘুড়ির দেশে ঘোরাঘুরি', 'যত ভাগ্য আকাশে' আর ছিল পোস্টার — 'সব ব্যাদে আছে', 'জি এম খাদ্যের বিপদ', 'চিকিৎসা চক্রান্ত' এমনই সব বিষয় নিয়ে হাজির ছিলেন চেতনার সদস্যরা। মানুষকে নানান প্রশ্নের উত্তরও দিতে দেখা গেল তাঁদের। মেলায় জিলিপি, কুলফি, ফুচকা ছিল না। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসকে যুক্তি ও বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করে মানুষের মনে বিজ্ঞানমনস্কতার আলো জ্বালাবার কঠিন কাজটা হাতে তুলে নিয়েছে হাতিবাগানের 'চেতনা'। তাই এই মেলার আয়োজন। নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য এবারে 'বিনোদিনী স্মৃতি সম্মান' পেলেন শ্রী হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। বিজ্ঞানমেলার সঙ্গে চেতনা গত ১৭ বছর ধরে এই সম্মান দিয়ে চলেছে।

গড়ের খেলা ক্রিকেট মাঠে

ভূপতি চক্রবর্তী

ক্রিকেট নিশ্চয়ই অনেকেরই প্রিয় খেলা। শুধু ছোটরা কেন আমাদের দেশের এত বিভিন্ন বয়সের এত মানুষ এই খেলাটিকে পছন্দ করেন, তার ইয়ত্তা নেই। টেলিভিশন, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে, স্কুলে, কলেজে, অফিসে বা আড্ডায় ক্রিকেটের প্রসঙ্গ আসবেই। ব্যাটসম্যান বা বোলারের পারফরমেন্স কেমন হল, ফিল্ডিংয়ে কারা দলকে ডোবাল কিংবা অধিনায়কের কোন সিদ্ধান্তটা একেবারে 'মাস্টার স্ট্রোক' ছিল এ নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। এই আলোচনায় অনেকেই তাঁদের প্রিয় খেলোয়াড় সম্পর্কে বলার সময় কেবল সুন্দর সুন্দর বাংলা বা ইংরাজি বিশেষণ প্রয়োগেই থেমে থাকেন না, রীতিমতো 'স্ট্যাটিস্টিক্স' দিয়ে তাঁদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।

ক্রিকেটের এই স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু বেশ মজার। এতে রয়েছে নানারকমের বৈচিত্র্য। আর এখন ভাল কম্পিউটারের সাহায্যে প্রতিটি খেলোয়াড় বা প্রতিটি খেলার সমস্ত ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করে বহু চিত্তাকর্ষক বিষয় নির্ণয় করার চেষ্টা হচ্ছে। কোন খেলোয়াড় কতটা ভাল বা কতটা কমজোরি তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে নানারকমের পরিসংখ্যানের সাহায্যে। আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব, এই বিষয়গুলি গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা গ্রহণযোগ্য।

প্রথমে আসা যাক, ব্যাটিং গড় নির্ণয় বিষয়ে। এমনিতে বিভিন্ন সংখ্যার গড় নেওয়ার ব্যাপারটা আমাদের খুব চেনা। সংখ্যাগুলিকে যোগ করে তাকে ঐ গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই মিলবে ঐ সংখ্যাগুলির গড়। অর্থাৎ যদি বর্ষাকালের একটি সপ্তাহের সাতদিন বৃষ্টির পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৮ মিলিমিটার বা মিমি, ১৪ মিমি, ৪ মিমি, ০ (শূন্য) মিমি, ১৮ মিমি, ১২.৫ মিমি ও ১০ মিমি তাহলে ঐ সপ্তাহে দৈনিক গড় বৃষ্টিপাত ঐ বিশেষ স্থানটির ক্ষেত্রে হবে ৯.৫ মিমি। এই গড়ের মান অবশ্যই সর্বোচ্চ (এ ক্ষেত্রে ১৮ মিমি) এবং সর্বনিম্ন সংখ্যার (এ ক্ষেত্রে শূন্য মিমি) মধ্যবর্তী কোনো সংখ্যা হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্রিকেটে ব্যাটিং গড় নেওয়ার সময় খেলোয়াড়টি যতগুলি ইনিংস খেলে মোট কত রান করেছেন তা দেখা হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু হিসেব করার সময় দেখা হয় তিনি কটি ইনিংসে নট আউট ছিলেন। ধরা যাক, কোনো ব্যাটসম্যান ১২টি ইনিংসে ৫৪৩ রান করেছেন এবং এই ১২টির মধ্যে দুটি ইনিংসে তিনি নট আউট ছিলেন। ক্রিকেটের ব্যাটিং গড়ের হিসেব অনুযায়ী তাঁর ঐ কটি ইনিংসে গড় রান পাওয়ার জন্য ৫৪৩কে ১২ দিয়ে ভাগ করে ৪৫.২৫ বললে ভুল হবে; ধরতে হবে ১০টি ইনিংস। অর্থাৎ যে দুটি ইনিংসে তিনি নট আউট ছিলেন ইনিংস গুনতিতে তার দুটি বাদ যাবে, যদিও ঐ নট আউট বা অসমাপ্ত ইনিংসে করা রান মোট রানের সঙ্গে যোগ হবে। ফলে মোট রান থেকে যাবে ঐ ৫৪৩ কিন্তু ইনিংস সংখ্যা নেমে আসবে ১০-এ আর গড় পৌঁছে যাবে ৫৪.৩০-এ, যা পাওয়া গেল ৫৪৩-কে ১০ দিয়ে ভাগ করে। আগের চেনা উপায়ে করা গড় থেকে এটা বেশ খানিকটা বেশি।

এর পেছনে একটা গাণিতিক না হলেও 'ক্রিকেটীয়' যুক্তি আছে। একজন ব্যাটসম্যানের জোর বা নির্ভরতা বোঝা যায় কেবল তাঁর করা রান দিয়ে নয়। কিংবা কটি ইনিংস খেলে সেই রান তিনি সংগ্রহ করেছেন সেটা বিচার করেও নয়। এখানে কিন্তু একই সঙ্গে দেখতে হবে ঐ রান সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি কতবার আউট হয়েছেন। যদি তিনি যথেষ্ট সংখ্যক ইনিংসে নট আউট থেকে যান, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি বেশ নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান এবং তাঁকে আউট করা বেশ কঠিন। আর ঠিক এই বিষয়টা যাতে তাঁর ব্যাটিং গড়ে প্রতিফলিত হয়, তাই এই হিসেবের ব্যাপারটা এরকম করা হয়েছে। একই সংখ্যক ইনিংস খেলে দু জন ব্যাটসম্যান যদি সমান রান করেন তাহলে এর মধ্যে যিনি কম বার আউট হয়েছেন তিনি যে শ্রেষ্ঠতর, তা মানতেই হবে, বোঝা গেল।

এবার তাহলে এক ক্রিকেটারের কথা কল্পনা করা যাক। ধরা যাক তাঁর নাম চন্দন সিং। ইনি ভাল বল করেন, কিছুটা ব্যাটিং করতে পারেন। চন্দন সিং কলকাতার ক্লাব ক্রিকেটে ৫০ ওভারের খেলায় ৬ নম্বর বা ৭ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে নামেন, যখন ব্যাটিংয়ের সুযোগ মেলে। শেষ দিকে খুব বেশি বল বাকি থাকে না বলে চন্দন অনেক সময়েই কয়েক রান

করে নট আউট থেকে যান। আমরা বছর ২০-র চন্দনকে তুমি করেই উল্লেখ করব।

ক্লাবের ১০টা ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পরে দেখা গেল চন্দন মোট ৮টা ম্যাচে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে রান করেছে যথাক্রমে ১৭, ৬, ১৮, ০, ৩, ১১, ১৩, ১২, এর মধ্যে সে আবার ৬টা ইনিংসেই আউট হয় নি। তাহলে ক্রিকেটের হিসেবে তার ব্যাটিং গড়ের হিসেব করতে হবে এইভাবে, মোট ইনিংস ৮, নট আউট ৬ এবং চন্দন মোট রান করেছে ৮০। অতএব তার ব্যাটিং গড় হচ্ছে ৪০.০, যা কিনা পাওয়া গেল ৮০কে ২ দিয়ে ভাগ করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই গড় কিন্তু তার একটি ইনিংসে করা সর্বোচ্চ রানের থেকে বেশি। অঙ্ক কিন্তু বলবে এটা ভুল, ক্রিকেট বলবে ঠিকই আছে। অনেকে চন্দনের ব্যাটিং গড়কে বলবেন বহু ব্যাটসম্যানের থেকে ভাল !

একজন বোলার কত রান দিয়ে কটি উইকেট পেলেন সেখান থেকে তাঁর দক্ষতার বিচার হবে এটাই স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে, রান আউট ছাড়া অন্য যে কোনো আউটের ক্ষেত্রে, তা সেখানে ফিল্ডারের যত উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই থাক না কেন, উইকেট বোলারের। তাই যে বোলার যত কম রান দিয়ে, যত বেশি উইকেট পাবেন তাঁর গড় হবে তত ভাল।

এবার দেখা যাক, বোলিং-এর বিষয়টি। একজন বোলার কত রান দিয়ে কটি উইকেট পেলেন সেখান থেকে তাঁর দক্ষতার বিচার হবে এটাই স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে, রান আউট ছাড়া অন্য যে কোনো আউটের ক্ষেত্রে, তা সেখানে ফিল্ডারের যত উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই থাক না কেন, উইকেট বোলারের। তাই যে বোলার যত কম রান দিয়ে, যত বেশি উইকেট পাবেন তাঁর গড় হবে তত ভাল। এখানে গড়কে আমরা ভাল বলছি, বেশি বলছি না, তার কারণ, বোলিং দক্ষতার বিচারের ক্ষেত্রে যে বোলারের বোলিং গড় যত কম, তিনি তত ভাল। যেমন ধরা যাক, ক্লাবের হয়ে ১০টা ম্যাচ খেলার পরে একজন বোলার মোট উইকেট নিয়েছেন ৩৬টি আর রান দিয়েছেন ৭৫২। এক্ষেত্রে তাঁর বোলিং গড় পাওয়া যাবে ৭৫২ কে ৩৬ দিয়ে ভাগ করে, অর্থাৎ তা দাঁড়াবে ২০.৮৯। তাঁরই সতীর্থ বোলার দেখা গেল পেয়েছেন ৪০টি উইকেট ঐ ১০টি ম্যাচে। কিন্তু মোট রান দিয়েছেন ১০০৭। অতএব তার গড় হচ্ছে ২৫.১৮, যা কিনা প্রথম বোলারের তুলনায় বেশি, অতএব খারাপ। উইকেটপিছু রান যে বোলার যত কম দেবেন, তাঁর দক্ষতা তুলনায় বেশি।

আবার ঐ দুই বোলারের ক্লাবে খেলেন এমন এক ব্যাটসম্যানকে ক্যাপ্টেন একটা ম্যাচে ডাকলেন বল করতে, কিছুটা হতাশা থেকেই তাঁর ডাক পড়ল কারণ বিপক্ষের একটি জুটিকে অনেকক্ষণ ভাঙা যাচ্ছিল না। এই ব্যাটসম্যানটি কদাচিৎ বল করেন কিন্তু সেদিন একটি মাত্র ওভারে ১৬ রান দিলেও তুলে নিলেন বিপক্ষের একটা উইকেট। ১০ ম্যাচে ঐ একবারই বল, আর একটাই উইকেট, ১৬ রান দিয়ে। অতএব তাঁর গড় দাঁড়াল ১৬.০০। দলের দুই নিয়মিত বোলারের থেকে এই ব্যাটসম্যানের বোলিং গড় তুলনায় ভাল হয়ে গেল !

বস্তুত এইজন্য এখন কোনো বোলারের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কেবল গড় দেখা হচ্ছে না, দেখা হচ্ছে তাঁর ইকনমি রেটও। বিশেষ করে ৫০ ওভারের খেলায়— পরিভাষায় যাকে বলা হয় একদিনের ক্রিকেট। ২০ ওভারের টি-২০ খেলায় এই ইকনমি রেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় বোলারের দক্ষতা বিচারে। যেহেতু সীমিত ওভারের ম্যাচে বোলারের দৃষ্টিকোণ থেকে উইকেট নেওয়াটা কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়। যিনি ওভার পিছু রান কম দিয়ে থাকেন অর্থাৎ যাঁর বোলিং ব্যাটসম্যানকে তুলনায় রান বেশি তুলতে দেয় না তাঁকেও বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বোলার ওভারপিছু কত রান দিয়েছেন, হিসেব করা হয় সেটা। বলাই বাহুল্য যিনি এক্ষেত্রে ওভারপিছু কম রান দিয়েছেন, বোলার হিসেবে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তিনিই দামি। আগের উদাহরণের দিকে তাকালে অবশ্য বলা যায় না যে, কার ইকনমি রেট ভাল, কেন না সে তথ্য সেখানে নেই। তবে বলা যায়, যে খেলোয়াড়টি মাত্র এক ওভারে ১৬ রান দিয়েছেন অর্থাৎ যার ইকনমি রেট ১৬.০০। তিনি সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বিশেষ জুতসই নন।

সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানকে দক্ষতা বিচারের ক্ষেত্রে কেবল তাঁর ব্যাটিং গড় নয়, দেখা হয় তাঁর স্ট্রাইক রেট। এই ধরনের ক্রিকেটে টেস্ট ম্যাচের মতো লম্বা সময় প্রয়োজনে ক্রিজ কামড়ে পড়ে থাকার বিশেষ মূল্য নেই। স্ট্রাইক রেট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখা হয় ব্যাটসম্যান কত বলে কত রান করলেন। তারপর তাঁকে প্রকাশ করা হয় ১০০ বলপিছু রানের হিসেবে। এর খানিকটা মিল পাওয়া যায় শতকরা হিসেবের সঙ্গে। যদি কোনো ব্যাটসম্যান , ধরা যাক ৪০ বলে ৪৩ রান করলেন তাঁর স্ট্রাইক রেট হবে [(43, 40)´ 100] ১০৭.৫। অর্থাৎ এই খেলোয়াড়টি

১০০ বলে যেন ১০৭.৫ রান করার মতো ব্যাট করেছেন। সবসময় এই হিসেব খুব যে ব্যাটসম্যানের দক্ষতা স্পষ্ট করে দেয় তা বলা যাবে না। যেমন ধরা যাক ঐ খেলাতেই তাঁর এক সতীর্থ ব্যাটসম্যান খেলেছেন দু বল, তার প্রথম বলটিতে তিনি বাউন্ডারি মেরে চার রান পেয়েছেন আর তার পরের বলেই তিনি আউট। অতএব দু বলে চার রান করার সুবাদে তাঁর স্ট্রাইক রেট ২০০, যা কি না পূর্ববর্তী ব্যাটসম্যানের তুলনায় ঢের ভাল। কিন্তু দলের দিক থেকে কাকে বেশি কার্যকর মনে হচ্ছে? তাই, স্ট্রাইক রেট দেখাটা জরুরি ঠিকই, কিন্তু সমস্ত কিছু সেখানে ধরা দেয় না। আর একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, স্ট্রাইক রেট হিসেবের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাটসম্যান কতবার আউট হয়েছেন কিংবা কটি ইনিংসে তিনি নট আউট রয়ে গেছেন, তা কিন্তু হিসেবে আসছে না।

ক্রিকেটের মাঠে খেলোয়াড়দের বিচারের জন্য কোনো হিসেবের উদ্ভাবনার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, তবে গণিতের মূল নিয়মকে ভেঙে ফেলা যাবে না। সে গল্পই সবশেষে এবার শোনাব। আমাদের চন্দনকে মনে আছে তো? সেই চন্দন তার ভাল বোলিংয়ের জন্য সুযোগ পেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলে। এই দলটি গেছে শ্রীলঙ্কা সফরে কয়েকটি টেস্ট ম্যাচ ও সীমিত ওভারের ম্যাচ খেলতে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম খেলা ঐ সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ কলম্বোতে। চন্দন চমৎকার ফর্মে রয়েছে, তাই প্রথম টেস্ট ম্যাচের ১১ জনের মধ্যেই রয়েছে তার নাম। আর ঠিক চন্দনের মতোই সদ্য ২০ পেরোনো এক নতুন বোলার নিয়েছে শ্রীলঙ্কাও। ধরা যাক তার নাম জয়রত্ন। প্রথম টেস্ট গোড়া থেকেই দারুণ জমে গেল। ব্যাটসম্যানেরা তেমন সুবিধা করতে পারছেন না। বোলারদেরই জয়জয়কার— বিশেষ করে চন্দন আর জয়রত্নের। ৫দিনের টেস্ট ম্যাচ খুবই উত্তেজনার মধ্যে শেষ হল পঞ্চম দিন লাঞ্চের কিছু আগে। ফলাফল : ম্যাচ 'টাই' অর্থাৎ ভারতের দু ইনিংস মিলিয়ে মোট রান শ্রীলঙ্কার দু ইনিংস মিলিয়ে মোট রানের সমান। চন্দন আর জয়রত্ন দু দিকের সবচেয়ে সফল বোলার। ওরা প্রত্যেকেই দু'ইনিংস মিলিয়ে ১০টি করে উইকেট নিয়েছে। দুটি ইনিংসে ওদের বোলিং কেমন ছিল নীচের সারণিতে দেখানো হল—

খুবই উত্তেজনার মধ্যে ম্যাচটি শেষ হল এবং টাই ম্যাচের নজির ক্রিকেটের ইতিহাসে খুব একটা নেই। সকলেই এখন অপেক্ষা করছেন ম্যান অভ দ্য ম্যাচ ঘোষণার জন্য। শ্রীলঙ্কা সমর্থকেরা নিশ্চিত জয়রত্নই ঐ পুরস্কার পাবে। দু ইনিংস মিলিয়ে ১০টা উইকেট! ভারতের চন্দনও দু ইনিংসে মোট ১০টা উইকেট নিয়েছে ঠিকই, তবে দেখা যাচ্ছে দু ইনিংসেই তার বোলিং গড় জয়রত্নের তুলনায় খারাপ। অতএব ওর কোনো আশা নেই।

মাইক্রোফোনে শোনা গেল কড়কড় আওয়াজ— ঘোষণা হচ্ছে ম্যান অভ দ্য ম্যাচের। হ্যাঁ, এই পুরস্কার পাচ্ছেন ভারতের বোলার চন্দন সিং তাঁর অসাধারণ বোলিংয়ের জন্য। যদিও জয়রত্নও খুব ভাল বোলিং করেছেন, তবু ম্যাচে চন্দনের পারফরমেন্স সেরা। ক্ষোভে ফেটে পড়লেন কলম্বোর দর্শকেরা। এমন একটা চমৎকার উপভোগ্য টেস্ট ম্যাচ সচরাচর হয় না অথচ তার শেষে কি না এমন একটা ধাক্কা! কেন চন্দন পাবে ঐ পুরস্কার? বোলিং গড়ে দু ইনিংসেই তার বোলিং গড় তো বেশি, তাহলে?

ততক্ষণে ধারাভাষ্যকার ডেকে নিয়েছেন চন্দনকে। ঘোষণা করছেন যে চন্দন এই ম্যাচে ১০টি উইকেট নিয়েছেন মাত্র ৪৪ রান দিয়ে অর্থাৎ উইকেটপিছু সে রান দিয়েছে ৪.৪, যা কিনা তার বোলিং গড়। জয়রত্নও ভাল বল করেছে, ১০টি উইকেট সেও নিয়েছে, তবে রান দিয়ে ফেলেছে বেশ খানিকটা বেশি। সে ১০ উইকেট নিয়েছে ১২৭ রান দিয়ে অর্থাৎ এই ম্যাচে তার বোলিং গড় দাঁড়িয়েছে ১২.৭। শ্রীলঙ্কার দর্শকেরা যথেষ্ট সচেতন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হাততালি দিয়ে চন্দনকে অভিনন্দন জানালেন। তবে সেই প্রশ্নটা কিন্তু তাঁদের থেকেই গেল। জয়রত্নের বোলিং গড় দু ইনিংসেই চন্দনের থেকে ভাল হওয়া সত্ত্বেও ম্যাচের বোলিং গড় চন্দনের অনেকটাই ভাল। চন্দনের যেখানে এই গড় ৪.৪ জয়রত্নের সেখানে ১২.৭। কিন্তু এটা কীভাবে হল? দু ইনিংসেই পেছনে থাকা চন্দন মোটের ওপর এগিয়ে গেল কীভাবে?

কী মনে হচ্ছে? ক্রিকেটের ব্যাপারটাই গোলমেলে? আগেই বলেছি, এটা কিন্তু একটা গাণিতিক সমস্যা, এর

ইনিংস	বোলার	উইকেট নিয়েছেন	রান দিয়েছেন	বোলিং গড়	মন্তব্য
প্রথম	জয়রত্ন (শ্রীলঙ্কা)	৩	১৭	৫.৬৭	প্রথম ইংনিসে বোলিং গড়
	চন্দন (ভারত)	৭	৪০	৫.৭১	চন্দনের থেকে ভাল
দ্বিতীয়	জয়রত্ন (শ্রীলঙ্কা)	৭	১১০	১৫.৭১	দ্বিতীয় ইনিংসেও
	চন্দন (ভারত)	৩	৪৮	১৬.০০	জয়রত্নের বোলিং গড় চন্দনের থেকে ভাল

সমাধান লুকিয়ে আছে নিছকই অঙ্কের মধ্যে। আমি এই সমস্যার সমাধান সরাসরি বলব না, একটা অন্য অঙ্ক এবং তার সমাধান বলে দেব, যার সাহায্যে বোঝা যাবে, জয়রত্ন দু ইনিংসেই ভাল বোলিং গড় রেখেও ম্যাচের বিচারে কেন পিছিয়ে গেল।

ধরা যাক, আমি আর আমার বন্ধু সুধীর দুজনেরই ১০টা করে খাতা কেনা দরকার। প্রথম দোকানে দেখলাম পুরনো স্টকের খাতা রয়েছে যার প্রতিটার দাম ১৬ টাকা। আমি সেখান থেকে মাত্র তিনটে খাতা কিনলাম এই আশায় যে, হয়ত এর থেকে ভাল খাতা এই দামে পাওয়া যাবে। আমার পরে সুধীর ঐ দোকানে গেল এবং ঐ একই খাতা চাইল। দোকানির মনে হল একটু বেশি দাম বললে কেমন হয়। দোকানি খাতা পিছু ১৭ টাকা দাম চাইলেও সুবীর কিনে ফেলেল ৭টা খাতা। এই পর্যায়ে আমি মোট ৪৮ টাকা খরচ করে তিনটে খাতা পেলাম আর সুবীর আমার থেকে খাতাপিছু এক টাকা বেশি দিয়ে ৭টি খাতা কিনল ১১৯ টাকায়। এখানে খাতাপিছু দাম কিন্তু আমিই কম দিয়েছি।

এবার অন্য দোকানে গিয়ে শোনা গেল খাতার একেবারে সাপ্লাই নেই তবে দোকানি প্রতিটি খাতা ২৬ টাকা হিসেবে তার হাতে থাকা কিছু খাতা বিক্রি করছেন। বাধ্য হয়ে আমি আমার যে ৭টি খাতা প্রয়োজন, তা কিনে নিলাম খাতাপিছু ২৬ টাকা দরে। এবার আমার মোট খরচ ১৮২ টাকা অর্থাৎ আমার হাতে যে ১০টি খাতা এল তার জন্য আমার মোট খরচ হল ২৩০ টাকা (৪৮ + ১৮২)। অতএব গড়ে খাতাপিছু খরচ হল ২৩ টাকা।

সুবীরও খাতার সন্ধানে হাজির হল দ্বিতীয় দোকানে। তার দরকার তিনটি খাতার। দোকানিও ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন। সুধীরের কাছে খাতা পিছু দাম হাঁকলেন ৩০ টাকা, যা আমার কাছ থেকে নেওয়া দামের তুলনায় খাতাপিছু ৪ টাকা বেশি। সুধীর কিছুটা বাধ্য হয়েই তার প্রয়োজনীয় তিনটে খাতা ওখান থেকে কিনে নিল ৯০ টাকায়। অর্থাৎ মোট ২০৯ (১১৯+৯০) টাকা খরচ করে তার হাতে এল ১০টি খাতা। খাতার গড় দাম দাঁড়াল ২০ টাকা ৯০ পয়সা বা ২০.৯০ টাকা।

ব্যাপারটা কীরকম হল? আমি ত প্রতি ক্ষেত্রেই সুধীরের থেকে কম দামে খাতা কিনেছি, আর মনে মনে ভেবেছি, যেন একটু জিতে গেলাম। কিন্তু শেষমেশ ফলটা তো অন্যরকম হয়ে গেল, তাই না? এই রাস্তাতেই হদিস মিলবে, কেন ম্যান অভ দ্য ম্যাচটা চন্দন পেল, জয়রত্ন নয়।

সাহায্যসূত্র: One Hundred Essential Things You Didn’t Know You Didn’t Know - John D Barrow– page 69 (w.w. Norton & Company, New York, London)

সংগঠন সংবাদ

বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া: স্থানীয় স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আয়োজন করেছিল প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবিরের। রবিবার, ১৮ জানুয়ারি। এটি তাদের দ্বিতীয় উদ্‌যোগ। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত চলে শিবির, নদী গবেষণা মন্দির বা রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। আশপাশের স্কুলের প্রায় শ’তিনেক পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। এই শিবির আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল– বাড়ির আশপাশের গাছপালার সঙ্গে পরিচয়, স্থানীয় পাখিদের চেনা, জলাশয়কে চেনা, পোকামাকড় ও প্রজাপতির সঙ্গে চেনাপরিচয়। সেই সঙ্গে শেখানো হল প্রকৃতির ছবি কীভাবে তুলতে হয়। উদ্যোক্তা সংস্থার পক্ষে যোগদানকারী ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য জলখাবার থেকে দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজনও ছিল।

দেখা হবে

কলকাতা বইমেলায়

মিলনমেলা প্রাঙ্গণে

আমাদের

স্টল নং ৪৮৯

লিটল ম্যাগাজিন

প্যাভিলিয়নের সামনে)

পুস্তক পর্যালোচনা

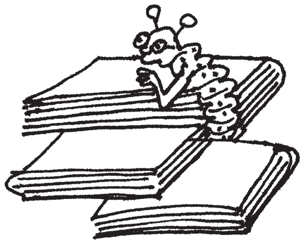

কত অজানারে জানাইলে তুমি...

পুলক লাহিড়ী

Ecosystem Management: Merging Theory and Practice
By DHRUBAJYOTI GHOSH
NIMBY BOOKS; Rs. 390. 2014

‘যে ধ্রুবপদ—’

শ্রী ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ পেশায় ছিলেন জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ার। দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিভাগে কাজ করেছেন সুনামের সঙ্গে (ঠোঁটকাটা মানুষদের কিছু দুর্নাম থাকে, সেটুকু বাদ দিলে!)। এই বৃত্তির মানুষদের কাছে আমাদের যে প্রত্যাশা থাকে, তা পূরণ করেও শ্রীঘোষ উপরন্তু একটি অসাধারণ কাজ করেছেন। পূর্ব কলকাতা জলাভূমির (নামটি তাঁরই দেওয়া) গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে গবেষণা করা এবং জনসমক্ষে এর উপযোগিতা তুলে ধরা। প্রায় ১০০ বছর ধরে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (প্রচলিত নাম ভেড়ি) যেভাবে এই শহরের অপরিচ্ছন্ন নাগরিক বর্জ্যময় জলকে প্রাকৃতিক উপায়ে অনেকটা পরিস্রুত করে তাকে মাছ, শাকসবজি বা শস্যের উৎপাদনের জন্য ব্যবহারযোগ্য করে তোলে, তা এক বিস্ময়। যাঁরা এর উদ্গাতা বা বাহক, তাঁরা কেউ ইকোলজি পড়েন নি, কিন্তু এই বিদ্যার মূল শিক্ষা তাঁদের উপলব্ধ। বস্তুত, প্রকৃতিতে বর্জ্য বলে কিছু নেই; ঐ নামে যা থাকে প্রকৃতি তাকে নানাভাবে ব্যবহার করে সম্পদের ভাণ্ডার গড়ে তোলে। নাগরিক বর্জ্য জলকে আমরা ‘দূষক’ ও অপাঙ্‌ক্তেয় বলে আখ্যা দিই, কিন্তু এই জল পুষ্টি মৌলতে (nutrient element) ভরপুর এবং তাকে খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে জীব বিবর্ধন (biomagnification) ঘটিয়ে জলাভূমির ঐ চাষীরা আক্ষরিক অর্থেই ধুলোকে সোনায় পরিবর্তিত করেছেন। শিক্ষিত বাঙালিদের ক’জন এ খবর রাখেন জানি না! শ্রীঘোষ পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে এই বর্জ্য সম্পদের ব্যবহারের সুফলকে জনসমক্ষে এনে একটি বড় সামাজিক দায়িত্ব পালন করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। মূলত তাঁর উদ্যোগ ও চেষ্টাতেই পূর্ব কলকাতা জলাভূমি, জলাভূমি বিষয়ে আন্তর্জাতিক নিয়ামক সংস্থার অধীন রামসর সূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একই সঙ্গে এই জলাভূমিটি অদ্বিতীয় বলে স্বীকৃতি পেয়েছে; এর ফলে ভবিষ্যতে একে অবিকৃত রাখা যাবে, প্রোমোটরদের হাত থেকেও বাঁচানো সম্ভব হবে। এটি তাঁর এক বড় অবদান।

সম্প্রতি তাঁর ‘Ecosystem Management - towards managing theory and practice’ শীর্ষক পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে। ইকোলজি বা বাস্তুসংস্থান বিষয়ে এটি তাঁর দ্বিতীয় পুঁথি। প্রথমটি, ‘Selected Essays on Welfare Ecology’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯১ সালে । Welfare Ecology থেকে Ecosystem Management, এই দীর্ঘপথ অতিক্রমণের অবকাশে বাস্তুসংস্থানকে তিনি কীভাবে এখন দেখেন বা ভাবেন— তার দিশা, দেখার ভিন্নতা ও তাঁর মননের আলো-আঁধারি বিষয়ে একটা ধারণা করা যায়। দ্বিতীয় পুস্তকটিই আমাদের আলোচনার বিষয় এবং এই পুস্তকে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে।

Ecosystem Management একটি অত্যন্ত সুলিখিত পুঁথি। Ecosystem বা তার management বিষয়ে আমাদের যে চিরাচরিত ধারণা, এটি তার বিপ্রতীপ। অনেক সময় ‘আর্মচেয়ার ইকোলজিস্ট’ বা বিদেশী পণ্ডিতদের লেখা বইপত্তর আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়; এইসব পাঠ্যপুস্তকের অনেক উৎপত্তির সঙ্গে এখানকার বাস্তব অবস্থা তেমন মেলে না। শ্রীঘোষ সে পথে হাঁটেন নি। তিনি ভারতের খুব সাধারণ

মানুষজন কীভাবে তার বাস্তুতন্ত্রে খুব স্বাভাবিক ভূমিজ পুত্র বা কন্যা হয়ে বাস করে, তার বাস্তুতন্ত্রকে পরম যত্নে লালিত করে এবং বংশ পরম্পরায় তা রক্ষা করে বা তার সমস্যার সমাধান করে, তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেই অবকাশে ইকোসিস্টেমের এক-একটি জট খুলে তার একটি সম্যক ও সাধারণ বোধগম্য চিত্র রচনা করেছেন। তাঁর কথন ভঙ্গীমাটি একেবারে পুরাণ বা রামায়ণ-মহাভারতের চিরকালীন কথক ঠাকুরের মতো। যা বলেছেন, তা চিৎকার করে বা জাহির করে বলেন নি, প্রাণের গভীর থেকে উঠে আসা উপলব্ধি অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন। তাঁর এই কথন মনকে খুব স্পর্শ করে, ফলে পাঠকের সঙ্গে মুহূর্তে তাঁর এক সহজ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। এই গল্পগুলি যেমন পুরাতন কিন্তু চিরনবীন, তেমনি তা ট্রাডিশনাল নলেজের এক আকর। বংশ পরম্পরায় এই জ্ঞান বাহিত হয়, যদিও তাঁর আক্ষেপ নতুন প্রজন্ম এই জ্ঞান আহরণে তেমন আগ্রহী নয়।

শ্রীঘোষের সংকলিত গল্প বা অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক কারণেই স্থানীয়। এইখানে বর্তমান সমালোচকের একটু ধন্দ আছে। ইকোলজি শুধু স্থানিক বিষয় নয়, এর বিস্তৃতি ও কর্মকাণ্ড বিশ্ব জুড়ে। তাই অ্যান্টার্কটিকায় কীটনাশক প্রয়োগ না করলেও সেখানকার পেঙ্গুইন বা সিল জাতীয় প্রাণীর দেহে কীটনাশক অবশেষ (pesticide) পাওয়া যায়। শ্রী ঘোষ যখন বলেন— ‘They have to think globally and act locally’ (পৃষ্ঠা ১২), তখন সেই বিশ্ববীণা বা চেতনার সুরটিই বেজে ওঠে। কিন্তু নামহীন অবয়বহীন অজস্র মানবগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট বা স্থানীয় সমস্যা সমাধান বা জীবিকার সুরাহা করার অভিজ্ঞতায় বিশ্বচেতনার কতটুকু প্রতিফলন ঘটে? বস্তুত এ ব্যাপারে তারা বড়ই উদাস, এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির কথা বারবার বলা হচ্ছে, সেখানে ভেড়ির পার ও আল বরাবর গাছ লাগানোর এক প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে। এর সঙ্গে শ্রীঘোষও যুক্ত ছিলেন। দুর্ভাগ্য, সেই গাছগুলির একটিরও অবশিষ্ট নেই, যদিও এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর অর্থসাহায্য দেওয়া হয়েছিল। কেন নেই? কেন না, ঐ জলাভূমির মাছচাষীরা মনে করেন যে, গাছ বড় হলে তাতে মাছখেকো বক, রাতচরা, পানকৌড়ি পাখিরা আস্তানা গড়বে, মাছ খাবে এবং তাতে তাদের ক্ষতি হবে। এ ছাড়া ঐসব গাছকে মাছের চোরাশিকারিরা ভবিষ্যতে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করবে, সুতরাং গাছ নৈব নৈব চ। ঐ এক কারণে জলজ উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ ডঃ সুবীর ঘোষ শোলা গাছ চাষের বিষয়ে জলাভূমির চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি। বিশ্ব যে এক সূত্রে বাঁধা এবং আমাদের সবারই এ বিষয়ে কিছু কর্তব্য আছে, এ তত্ত্বের গ্রাহক অন্তত এদের মধ্যে আমি পাই নি। শ্রীঘোষ তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, ইকোলজিস্ট হতে গেলে ইকোলজিস্ট না হলেও চলে (পৃষ্ঠা ৪)। অতটা নিঃসংশয় পুস্তক-সমালোচক নন। ন্যূনতম শিক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। উন্নয়ন, বনসংরক্ষণ, বড় বড় বাঁধ— এইসব নানা কারণে উৎখাত হওয়া হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে শ্রীঘোষ সমমর্মিতা অনুভব করেন। আরিত্‌মা, মরিচঝাঁপি ইত্যাদি জায়গার মানুষদের উৎখাত করতে সরকার যে কত মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, শ্রীঘোষের এই বইটি তার এক বড় দলিল। শ্রীঘোষের লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি ফারহাদ কন্ট্রাক্টরের ‘সমভাব ট্রাস্ট’ কীভাবে পুরনো দিনের জল সংরক্ষণের রীতি ‘জোহাদ’-কে কাজে লাগিয়ে রাজস্থানের আলোয়ার জেলার রাজগির তালুকের নানদুয়ালি নদীর মরা সোঁতাকে আবার জলপূর্ণা করে তুলেছে। স্থানীয় মানুষের উদ্যম, আগ্রহ ও পরিশ্রমে মাত্র ২৪ লাখ টাকা খরচ করে ৫ বছরেই নদীটিকে সজীব করা সম্ভব হয়েছে। ছত্তিসগড়ের সানক্-কারমারি গ্রামের শ্রীদামোদরজিও এইভাবে গ্রামের লোকের সহায়তায় লুপ্ত বনকে ফিরিয়ে এনেছেন, এ সবই ট্রাডিশনাল জ্ঞানকে ব্যবহার করে। শ্রীঘোষকে ধন্যবাদ, হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া এমনতর অনেক কাহিনী তিনি আমাদের এই পুস্তকটির মাধ্যমে জানিয়েছেন।

কয়েকটি শব্দ শ্রীঘোষের প্রিয়তর। যেমন pedagogy বা epistemology— এই শব্দদ্বয়ের বহুল ব্যবহার সম্ভবত তাঁর অবচেতন মনের প্রতিফলন ও মানসিকতার দিক্‌চিহ্ন। বইটিতে মুদ্রণ ত্রুটি নেই। বইটির এক বড় আকর্ষণ, অমিত রায়ের আঁকা কার্টুনধর্মী চিত্রগুলি। তুলনায় সম্ভবত স্বল্প পরিসরের কারণে মানচিত্রগুলো মার খেয়েছে। ১৭১ পৃষ্ঠায় বানসুংকে মায়ানমারের অন্তর্গত বলা হয়েছে, আমার ধারণা জাভা, ইন্দোনেশিয়া হবে। বইটির গ্রন্থপঞ্জি ঈর্ষণীয়। ইকোলজি ও ইকোসিস্টেম সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবহিত করতে এই বইটি বড় ভূমিকা নেবে। বইটির মূল্য (৩৯০.০০) আর একটু কম হলে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হত। শ্রীঘোষের মতো বর্তমান সমালোচকেরও আশা, ইকোলজির বর্তমান পুস্তকগুলি তাদের জাড্য ভেদে নতুন রূপে বিবর্তিত হবে। নানা দুর্বোধ্য থিয়োরি, জটিল অঙ্ক বা অবাস্তব মডেলের মায়া কাটিয়ে তা মানুষের কথা বলবে। আগামী দিনেও শ্রীঘোষ আমাদের নানা অভিজ্ঞতার গল্প শোনাবেন, আমরাও তা টানটান হয়ে শুনব— এরকম আশা করতেই পারি।

উমা

আলোর পথযাত্রী

পূরবী ঘোষ

শেষপর্যন্ত ফাঁসিই হল ইরানি তরুণী রেহানা জাব্বারির। হ্যাঁ, মাত্র উনিশ বছর বয়সে সে ইনটিরিয়র ডেকরেশনকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে শুরু করেছিল জীবনের পথচলা। কিন্তু রেহানা পারল না পথচলা সম্পূর্ণ করতে। হঠাৎ তার জীবনে নেমে এল বিপর্যয়।

২০০৭ সালে রেহানার নিজের দেশ ইরানের একটি কাফেতে মোর্তজা আবদোলালি সারাবান্দি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হয়। তারপর সেই সারাবান্দি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে রেহানাকে নিজের অফিসে আসতে বলে। আলাপের পরদিন রেহানা সারাবন্দির অফিসে পৌঁছয়। নানা কথাবার্তার পর সারাবান্দি রেহানাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে আত্মরক্ষার জন্য সে পকেট থেকে ছুরি বের করে সারাবান্দিকে আঘাত করে পালিয়ে যায়। আর সারাবান্দি প্রচুর রক্তক্ষরণে মারা যায়। গ্রেপ্তার করা হয় রেহানাকে। গ্রেপ্তারের পর তাকে দু মাস নির্জন কক্ষে রাখা হয়। তারপর থেকে ফাঁসি কার্যকর হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর বিচারের প্রহসন চালিয়ে অবশেষে ২০১৪-র ২৫ অক্টোবর তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

রেহানা সারাবান্দিকে আঘাত করার অপরাধ স্বীকার করেছে। ২০০৯ সালে ইরানের আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, জাতিসঙ্ঘসহ অন্যান্য সংগঠন রেহানার মৃত্যুদণ্ড রদের দাবি জানায়। সারা বিশ্বে তার ফাঁসির আদেশ প্রত্যাহারের জন্য ২০,০০০ স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। কিন্তু তাতে মন গলে না বা বিচারের রায় টলে না ইরান সরকারের। অবশেষে ২০১৪-র ২৫ অক্টোবর ২৬ বছরের তরুণী রেহানা জাব্বারির ফাঁসি হয়ে যায়। আমরা, যারা ইরান থেকে বহু দূরে আছি, তারাও এই ঘটনায় নাড়া খেয়ে যাই। মনে হয়, ‘অদ্ভুত আঁধার এক নেমেছে এই পৃথিবীতে আজ’।

যাই হোক, যে কারণে রেহানাকে নিজের মনে হয়েছে, কাছের মনে হয়েছে, সেই কারণটি হল– ফাঁসির আদেশ শোনার পর সে কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রাণভিক্ষা চায় নি। মাথা সোজা রেখে সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করে দিয়েছে দেশের মানুষের জন্য। ফাঁসির আগে উকিলের মাধ্যমে রেহানা মাকে একটা ভয়েস মেসেজ পাঠায়। চিঠি লিখলে নানারকম আইনি জটিলতায় মার কাছে পৌঁছানোটা অনিশ্চিত মনে করেই সে ভয়েস মেসেজটি পাঠিয়েছিলেন। কী ছিল এই মেসেজটিতে? এই মেসেজটি ন্যাশনাল কাউন্সিল অভ রেজিস্ট্যান্স অভ ইরান নামে একটি সংগঠন ইংরাজিতে অনুবাদ করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। আমরা ইন্টারনেট থেকে এই মর্মস্পর্শী মেসেজটি পেয়েছি। রেহানা বলেছে:

আমার আদরের প্রিয় মাগো,

আমি আজ জানলাম, আমার আজ ইরানের প্রতিশোধমূলক আইনের মুখোমুখি হওয়ার পালা। আমি আহত হয়েছি এই ভেবে যে, তুমি আমাকে জানাও নি যে, আমি আমার জীবনের শেষ পাতায় পৌঁছে গেছি। তুমি কি মনে কর না, এটা আমার জানা উচিত ছিল? তুমি জানো, তোমার দুঃখে আমি কতটা লজ্জিত। মাগো, তোমার আর বাবার হাতে শেষ চুমু খাওয়ার সুযোগ আমায় কেন দিলে না মা? পৃথিবী আমাকে ১৯ বছর বাঁচার সুযোগ দিয়েছে। ওই অলুক্ষুণে রাতে আমি খুন হয়ে যেতে পারতাম। আমার শরীরটা শহরের কোনো এক কোণে ফেলে রাখা হত, আর কয়েকদিন পর পুলিশ আমার দেহ সনাক্ত করার জন্য তোমাকে ওইখানে নিয়ে যেত, আর তখন তুমি জানতে পারতে যে

তোমার মেয়েটা ধর্ষিতা হয়েছিল। তারপর তুমি এক লজ্জাজনক ও দুঃখবহ জীবনযাপন করতে করতে একদিন মারা যেতে। আর সেটাই ঘটত।

যাই হোক, ওই অভিশপ্ত ঘটনার ফলে গল্পটা পাল্টে গেল। রাস্তার ধারের বদলে আমার দেহটা নিক্ষিপ্ত হল ‘এভিন’ নামে এক বন্দিশালার নির্জন কক্ষে। আমি আমার নিয়তিকে মেনে নিয়েছি। তুমি তো জানো মাগো, মৃত্যু জীবনের শেষ কথা নয়। তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে, একজন জন্মায় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য, শিক্ষাগ্রহণের জন্য। আর প্রত্যেকটা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে চেপে যায় দায়িত্ব। আমি শিখেছিলাম, কখনও কখনও একজনকে লড়ে যেতে হয়। তুমি শিখিয়েছিলে মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য এই লড়াই চালাতে হয়, ঘটনার প্রতিবাদ করতে হয়। তুমি আমাদের শিখিয়েছিলে স্কুলে পড়ুয়াদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ও অভিযোগের সময় আমরা যেন নম্র থাকি। তোমার মনে আছে, আমাদের কীরকম আচরণ হওয়া উচিত তা তুমি বারেবারে শিখিয়ে দিতে। কিন্তু মা, আজ যখন আমার এই ঘটনা ঘটল, আমার শিক্ষা তখন আমাকে কোনো সাহায্য করল না!

আদালতে আমাকে হাজির করানো হল একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনি ও নির্দয় অপরাধী হিসেবে। আইনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকায় আমি করুণাভিক্ষা করি নি, আর মাথা নিচু করে কাঁদিও নি মা। ঘটনাটা ঘটার সময় আমার হাতে পালিশ করা লম্বা নখ ছিল। আমার হাত মুষ্টিযোদ্ধা বা খেলোয়াড় মেয়েদের হাতের মতো নয়, বিচারক বিচারের সময় এই দিকটাকে খেয়ালই করলেন না। আর এই দেশ যাকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলে তুমি, সেই দেশ আমাকে চাইল না এবং যখন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশ্নকর্তার আঘাতে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম, তখন কেউ আমাকে সমর্থন তো করলই না, উপরন্তু আমি শুনতে পেলাম আমার সম্পর্কে তীব্র কটূক্তি।

মাগো, তুমি যা শুনছ, তার জন্য কেঁদো না। আমার কথা কখনও ফুরোবে না। আমি আমার এই সমস্ত কথা একজনের কাছে রেখে যাচ্ছি, যাতে তোমার অনুপস্থিতিতে ও অজ্ঞাতে আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলে সেগুলো তোমার কাছে পৌঁছে যায়।

যাই হোক, আমার মৃত্যুর আগে তোমার থেকে একটা জিনিস চাই, আর যেভাবেই হোক না কেন তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, সমগ্র বিশ্ব, এই দেশ এবং তোমার কাছ থেকে এই একটিমাত্র জিনিসই আমি চাই। আমি জানি, তার জন্য তোমার সময়ের দরকার। কেঁদো না মা, শোনো। আমি চাই, তুমি আদালতে গিয়ে ওদেরকে আমার অনুরোধের কথা জানাও। জেলের ভেতর থেকে তোমাকে চিঠি লিখতে চাই না, কারণ তার জন্য জেলপ্রধানের অনুমোদন দরকার হবে এবং আমার জন্য তোমাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে। এটা একমাত্র জিনিস যেটার জন্য তুমি আবেদন করলে আমি কিছু মনে করব না।

আমার আদরের মাগো, আমি চাই না মাটির নিচে আমার শরীরটা পচুক। আমি চাই না, আমার চোখ, আমার তাজা হৃৎপিণ্ডটা ধুলোয় মিশে যাক। তাই আমার প্রার্থনা, আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর থেকে প্রতিস্থাপনযোগ্য সবকিছু, আমার হৃৎপিণ্ড, কিডনি, চোখ, হাড় সব বের করে যাদের প্রয়োজন তাঁদের যাতে দান করা যায়, তার ব্যবস্থা করা হোক।

আমি চাই না, তাঁরা আমার নাম জানুক বা পুষ্পস্তবক দিক অথবা আমার জন্য প্রার্থনা করুক। আমি চাই না, আমার জন্য তুমি কালো পোশাক পরো। মৃত্যুর আগে পৃথিবীকে আমার প্রণতি জানাচ্ছি এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছি। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তোমাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলাম। মাগো, আমি তোমাকে ভালবাসি।

রেহানা জাব্বারি

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার
ফোন নম্বর: ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

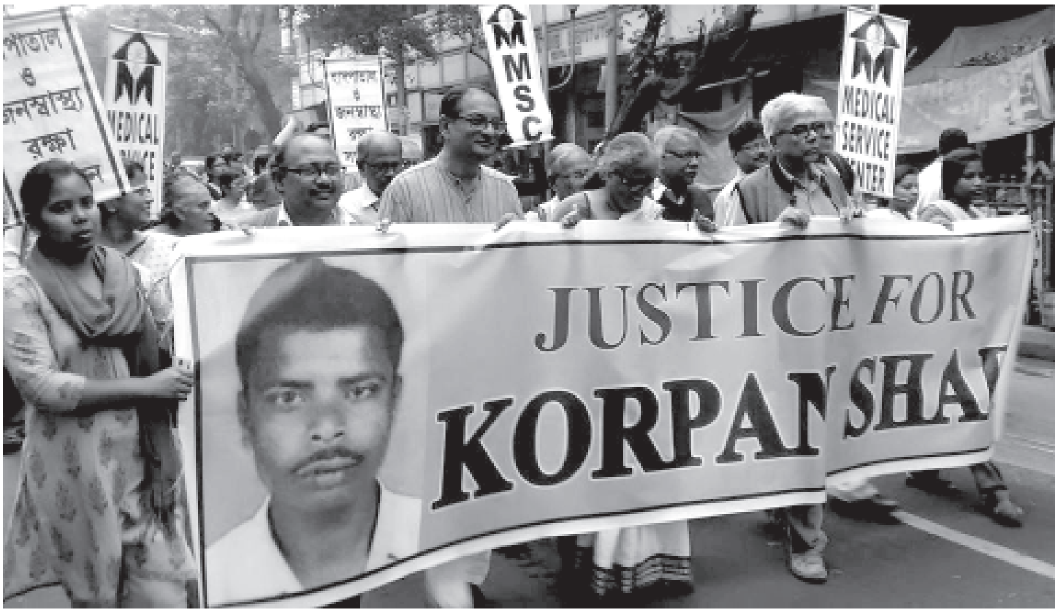

সম্পাদক, উৎস মানুষ

এ কোন সকাল !

সকালে খবরের কাগজ খুলেই মনে হল, ‘এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার।’ কাগজের খবর অনুযায়ী এন আর এস হাসপাতালে ডাক্তারি ছাত্রদের হস্টেলে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। খবরটা পড়ার পর মনে হল, সমাজের যারা এগিয়ে থাকা অংশ, যাদের হাতে থাকবে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য, তারাই যদি খুনের মানসিকতা পোষণ করে, তাহলে আমরা ভরসা করব কাদের ওপর ?

ইতিপূর্বে ডাক্তারি ছাত্রদের হস্টেলে গাঁজা-ভাঙ-হেরোইন ইত্যাদি নানাবিধ নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য পাওয়া গেছে। এমনকি অতিরিক্ত মাদক সেবনে মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটে গেছে। খবরগুলো পড়ে তখন মনে হয়েছিল, হয়ত অতিরিক্ত পড়ার চাপ বা বদ সঙ্গদোষে এসব হয়েছে, এগুলো কেটে যাবে। কিন্তু গত ১৭ নভেম্বর যা ঘটল, তা আমাদের সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে, একজন মানুষকে খুন করে ফেলার মতো অপরাধকে কোনো যুক্তি দিয়েই কাটানো যাবে না। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ বলে দিলেন, সামনে ওদের পরীক্ষা, সুতরাং কোনো চাপ ওদের দেওয়া যাবে না, কারণ একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে ! অতএব কোনো তদন্ত কমিশন বসানো যাবে না। খবরটা পড়ে মনে হল, একজন মানুষের প্রাণের চেয়েও এইসব মারকুটে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হওয়ার ভাবনায় ভাবিত হলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। ভাবতে অবাক লাগে, এঁরাও এক-একজন চিকিৎসক। সত্যিই কী বিচিত্র এই দেশ !

বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধানে জানা গেল যে, কোরপান শাহ্ নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক হাসপাতালের খোলা গেট দিয়ে কোনোভাবে ঢুকে পড়ে এবং ছাত্রাবাসের ওপরে উঠে যায়। হয়ত সে কোনো ঘরে উঁকি দিয়ে থাকতে পারে। হবু ডাক্তারবাবু ঘুমচোখে নিজের মোবাইল দেখতে পান নি, কোরপানের উঁকি দেওয়া মুখখানি দেখতে পেয়েছিলেন। ব্যস্! ফোন চোর কোরপান, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেই তিনি সপার্ষদ কোরপানের বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিলেন ! শুধু তাই নয়, তাদের ডাক্তারি শিক্ষা কতটা সফল হয়েছে তার প্রমাণ দিতে কোরপানের দেহের নিম্নাঙ্গে অদ্ভুতভাবে ব্লেড চালিয়ে ও মেরে তাঁকে মেরে ফেললেন। শাবাশ, ভাবী ডাক্তারবাবুরা !

শান্তিদা, আমাদের পুরনো চিকিৎসকবন্ধু জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ডাক্তার শান্তিরঞ্জন মল্লিকের সঙ্গে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে বলতে এক সময় শান্তিদা বলে ফেললেন, ‘এদের কাজ দেখে ডাক্তার হিসেবে আমি লজ্জা বোধ করছি’।

সীমিত সামর্থ্য ও ক্ষমতার ফলে এই নারকীয় ঘটনার জোরালো প্রতিবাদ করে উঠতে পারছি না। তাই আপনার পত্রিকার মাধ্যমে আমার নিন্দা ও ধিক্কার জানালাম এইসব খুনে ভাবী ডাক্তারবাবুদের উদ্দেশে।

অনামিকা রায়,
হাওড়া

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হবার নিয়ম

বছরে ৪টি বেরোয়, ৩ মাস অন্তর। চাঁদা বছরে ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ইউ বি আই-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা অন্য যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা জমা দিন ইউ বি আই কলেজ স্ট্রিট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

United Bank of India
College Street Branch, Kolkata- 700073
UTSA MANUSH
SB ACCOUNT NO. 0083010748838
IFSC NO. UTBI0COLI08

ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

উৎস মানুষ পত্রিকা ও বই পেতে যোগাযোগ করুন

দীপক কুন্ডু
২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা - ৭০০০১২
(কলেজ স্ট্রিট কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)
ফোন নং- ৯৮৩০২ ৩৩৯৫৫

পুস্তক তালিকা

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ	৪২.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্‌ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
এটা কী ওটা কেন সংকলন	৫০.০০
যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫০.০০
আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান সংকলন	৫০.০০
আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক নিরঞ্জন ধর	১০০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি	৬০.০০
প্রমিথিউসের পথে	৩৫.০০
লেখালিখি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি সংকলক: প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৪০.০০
মূল্যবোধ সংকলন	৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান: দীপক কুন্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প ১৮বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৩১, জ্ঞানের আলো (যাদবপুর কফি হাউসের উল্টোদিকে), থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, ডঃ গৌতম মিস্ত্রি, ইন্সট্যান্ট ডায়গনস্টিক সার্ভিসেস, মন্ত্রিবাড়ি রোড। পো.অ. - চৌমাথা। আগরতলা-৭৯৯০০১। (০৩৮১)২৩০৮২৪৪/২৩১২৯৩৭। ডাঃ শান্তিরঞ্জন মল্লিকের চেম্বার— কোন্নগর।